শরীর চর্চার আলোকে
বাংলার লোকক্রীড়া

অধ্যাপক অলোক ব্যানার্জী



পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

Sarir Charchar Aloke Banglar Lokokrira

by

Prof. Aloke Banerjee & Dr. Zia-Ul-Alam

মে দিবস, ১৯৯৮

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রক ঃ
জোকো প্রিন্টিং ওয়ার্ল্ড
৪১এ, রামকমল স্ট্রিট,
খিদিরপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩
দূরভাষ - ২৪৫৯ ৭ ৩৪/৩১০৩ ৪ ১



ক্রীড়া বিজ্ঞান
আন্দোলনের
সক্রিয় সাথীদের
উদ্দেশে



বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ

সক্রিয়তা ও কর্মক্ষমতা জীবের ধর্ম। এই সক্রিয়তা ও কর্মক্ষমতাই সমস্ত জীবকে প্রাণবন্ত করে রাখে। মানুষ সহ সমস্ত জীবের ক্ষেত্রে এই সক্রিয়তা বিরাজমান। আদিম কালে মানুষকে বাঁচার জন্য, খাদ্যের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, সর্বদা সক্রিয় ও কর্মক্ষম থাকতে হয়েছে, যা ছিল প্রকৃতই বাঁচার লড়াই। পরবর্তীকালে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখেছে, চাষবাস শিখেছে, শিখেছে ফসল মজুত করতে। আর তখনই অবকাশ পেয়েছে চিন্তার, ভাবনার, কল্পনার। এইভাবেই মানব সভ্যতার ক্রম অগ্রগতি ঘটেছে। বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার ভৌত ও সামাজিক পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ও মানুষের নব সংস্কৃতি মানুষকে এমন এক জায়গায় ঠেলে নিয়ে এসেছে যা তার জৈবিক অভিযোজন ক্ষমতার চাইতেও বেশী। প্রযুক্তির এই অভাবনীয় উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের মৌলিক জৈবগুণ, জৈব ক্রিয়াকলাপ এবং জৈব চাহিদার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। বর্তমান যুগে খাদ্যের জন্য জন্তু জানোয়ারদের পেছনে ছুটতে হয়না, গাছে উঠতে হয়না, বনে জঙ্গলে দৌড়ে বেড়াতে হয় না, সাঁতরে নদী পার হতে হয় না, কিন্তু ঐ শারীরিক ক্রিয়াকলাপে নিজেকে নিযুক্ত রাখার আকুতি মানুষের মধ্যে বংশ পরম্পরায় রয়ে গেছে। মৌলিক জৈব প্রক্রিয়াগুলি সুষ্ঠুভাবে চলতে দিতে হলে, সুস্থ থাকতে হলে, শারীরিক পটুত্ব বজায় রাখতে হলে এবং কর্মক্ষমতা বাড়াতে হলে সক্রিয়তা একান্ত প্রয়োজন। এই সক্রিয়তারই অন্যতম রূপ ক্রীড়া। ক্রীড়ার মাধ্যমেই লক্ষ্য করা যায় সমস্ত জীবের আত্মপ্রকাশ। ক্রীড়া হচ্ছে জন্মগত, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত এক আন্তরিক উদ্যোগ।[১] সারল্য ও স্বাধীনতা ক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য। ক্রীড়া জীবশিশুকে ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে দেয়, সতেজ ও কর্মঠ হতে সাহায্য করে, আনন্দ জোগায়, ক্লান্তি দূর করে। ক্রীড়া আবেগকে সংযত করে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করে এবং অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিরাট সামাজিক ভূমিকা পালন করে।

কর্মমুখর জীবনের মাঝে মানুষ যখনই অবসর পেয়েছে তখনই সেই অবসর আনন্দদায়ক ও সৃষ্টিমূলক কাজে অতিবাহিত করার চেষ্টা করেছে। আর এই অবসর অতিবাহিত করার বাসনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ক্রীড়ার। বেঁচে থাকার সংগ্রামে, নিজের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে মানুষকে শিখতে হয়েছে কিছু শারীরিক কলা কৌশল। সেই বাঁচার কলাকৌশলের অনুকৃতি ও সৃষ্টিমূলক কিছু করার বাসনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া। এক একটি জাতি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকেই শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ও খেলাধূলার উপর জোর দিয়েছে। এক একটি জাতি সত্তা তার নিজস্ব দর্শন ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ উদ্ভাবন করেছে। সময়ের সঙ্গে তাল

রেখে সেই সমস্ত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও নব নব সংস্করণ হয়েছে। কখনো কখনো তা উন্নত ও সৃষ্টিশীল হয়েছে। ক্রীড়া মানুষের সামাজিক জীবনের একটি ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। বলা যেতে পারে, মূল সৃষ্টির সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্বলিত ক্ষুদ্রতর আর একটি সৃষ্টি। ক্রীড়া বর্তমান সমাজে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। সমাজের যে কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেমন পদমর্যাদা, ক্ষমতা, বিত্ত, ব্যক্তির ভূমিকা এবং এগুলিকে ঘিরে যে দ্বন্দ্ব থাকে ক্রীড়া এর ব্যতিক্রম নয়, বরং অনুরূপ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ক্রীড়ার সহজাত সংযোগ রয়েছে যেমন শিক্ষার সঙ্গে, অর্থনীতির সঙ্গে এমন কি পরিবারের সঙ্গে।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, অবসর আনন্দদায়ক ও সৃষ্টিমূলক কাজে অতিবাহিত করার বাসনা থেকেই সৃষ্টি ক্রীড়ার। গ্রামীণ মানুষ বিশেষ করে কিশোর কিশোরীরা এই অবসর সময় অতিবাহিত করার মাধ্যম হিসাবে খুঁজে নিয়েছিল লোকক্রীড়াকে। লোকক্রীড়ায় প্রকাশ পায় বাস্তব জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার অনুকৃতি। কিশোর কিশোরীরা বড়দের আচার আচরণকে অনুকরণ করে এই লোকক্রীড়াগুলির মাধ্যমে। আর তাই তারা ঘরের ভেতরের, ঘরের বাইরের, জলের, স্থলের, গাছের নানা ধরনের খেলার আবিষ্কার করেছিল। এই খেলাগুলির মধ্য দিয়ে তারা পেত সীমাহীন আনন্দ। 'গাদি', 'ডাংগুলি', 'গোল্লাছুট', 'এক্কাদোক্কা', 'বউছি' প্রভৃতি লোকক্রীড়াগুলি গ্রামীণ মানুষকে আনন্দের জোয়ারে ভরিয়ে রাখত। বিনোদন ছাড়াও সমাজ মনস্তত্ত্বের হদিস খুঁজে পেতে এই লোকক্রীড়াগুলির ইতিহাস জানা জরুরী। সামাজিক ইতিহাস ও লোকসমাজের মানসিকতার পরম্পরার অনেক সূত্র রয়েছে এই সব লোকক্রীড়ায়। বর্তমান গ্রন্থে লোকক্রীড়ার তথ্যানুসন্ধানই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ক্রীড়াকে বাদ দিয়ে বা ক্রীড়ার সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যতিরেকে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানো কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই ক্রীড়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা লোকক্রীড়ার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক হবে।

ক্রীড়ার সংজ্ঞা সন্ধান ঃ

ক্রীড়া মানুষের জন্মগত প্রবণতা। সভ্যতার ঊষা লগ্ন থেকেই এর উৎপত্তি। এর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ যুগে যুগে। শুধুমাত্র মানুষ নয়, প্রাণীর মধ্যেও এই আকর্ষণ সমভাবে বিরাজমান। মানুষ বিশেষতঃ শিশু তার অবদমিত আবেগের মুক্তি খুঁজে পায় ক্রীড়ার মধ্যে। ক্রীড়া মানুষের সুস্থতা ও সবলতা বৃদ্ধি করে। মানুষের জীবনযাত্রার পথে নবশক্তির সঞ্চার করে। বিভিন্ন ক্রীড়াবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মনোবিদ ক্রীড়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। বিখ্যাত মনোবিদ রস (Ross) বলেছেন, "Play is joyful, spontaneous, creative activity in which man finds his fullest self-expression." (ক্রীড়া হল মানুষের আনন্দদায়ক, স্বতঃস্ফূর্ত, সৃষ্টিশীল ক্রিয়া যেখানে মানুষ তাকে প্রকাশের সবথেকে বেশী সুযোগ পায়)।[২] ষ্টার্ন (Stern) উল্লেখ করেছেন, "Play is a kind of voluntary self-constrained activity." (ক্রীড়া স্বেচ্ছায় বাধা অতিক্রম করার ক্রিয়া)।[৩] প্রাচীনপন্থী মনোবিদ এ্যাঞ্জেল (Angel) বলেছেন, "In little children

the impulse to play is practically identical with the impulse to use voluntary muscle." (ক্রীড়া পেশীর স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চালনের সমতুল্য)।[৪] প্রবৃত্তিতত্ত্বের প্রবর্তক ম্যাকডুগাল (Mcdougall) বলেছেন, 'Play is the out come of the primal libido or vital energy flowing not in the channel of instinct, but over flowing, generating a vague appetite for movement and finding out let in any or all the motor mechanism in turn." (আমাদের জন্মগত প্রবণতাগুলির শক্তি যখন স্বাভাবিক পথে প্রকাশিত না হয়ে সমাজ সম্মত কোন পথে প্রকাশিত হয় তখনই তাকে ক্রীড়া বলা হয়)।[৪] অধ্যাপক গালিক (Gulick) উল্লেখ করেছেন, "Play is what we do, when we are free to do what we will." (নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করাকেই ক্রীড়া বলে)।[৫] ড্রিভার (Drever) বলেছেন, "In play the value and significance of the activity are found in the activity itself." (ক্রীড়ার মধ্যে কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার লিপ্সা থাকে না, তাই সেখানে কোন কিছু প্রাপ্তির আনন্দ নেই, আছে নির্মল স্বাভাবিক আনন্দ)।[৪] লেজারাস (Lezarus) বলেছেন, "Play is an activity which is in itself free, aimless, amusing and diverting." (ক্রীড়া হল মুক্ত, লক্ষ্যহীন, আনন্দদায়ক ও বৈচিত্র্যময় ক্রিয়া)।[৫] জন হুইজিঙ্গা (John Huizinga) দাবি করেন, "All children play and they play remarkably alike." (সমস্ত শিশুই খেলে যেগুলি বৈশিষ্ট্যে প্রায় একই রকম)।[৫] টি. পি. নান (T. P. Nunn) উল্লেখ করেছেন, "Play is profound menifestation of creative activities." (ক্রীড়া সৃষ্টিশীল কাজের নিগূঢ় প্রকাশ)।[৫] হার্লক (Hurlock) বলেছেন, "Play relates to any activity engaged in for the enjoyment it gives, without consideration to the end result." (ক্রীড়া হল একটি আনন্দদায়ক ক্রিয়া যেখানে ফলাফলের গুরুত্ব গৌণ)।[৬] রাইবার্ন (Ryburn) বলেছেন, "Play is a way, a means which is used by the self when the different instinctive urges are trying to express themselves." (ক্রীড়া হল এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলি নিজে নিজে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করে)।[৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ক্রীড়ার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে। ক্রীড়া মানুষের জন্মগত সাধারণ প্রবণতা, ক্রীড়া স্বতঃস্ফূর্ত আচরণধর্মী, ক্রীড়া সৃজনশীল, ক্রীড়া শিশুর সামাজিক, মানসিক, শারীরিক গুণ বিকাশের সহায়ক, ক্রীড়ার মধ্যে আনন্দের ও তৃপ্তির ভাব নিহিত থাকে, ক্রীড়ায় শিশুর স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশ সাধন হয়।

বিভিন্ন ক্রীড়া বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মনোবিদদের প্রদত্ত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করে ক্রীড়ার একটি সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে — "নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, স্বাধীনভাবে মানুষ যখন আত্মতৃপ্তি ও আনন্দলাভের জন্য সৃজণাত্মক কাজে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে ক্রীড়া বলা যায়।"

ক্রীড়া কথাটি ইংরাজীতে 'Play', 'Game' এবং 'Sports' এই তিনটি শব্দের ক্ষেত্রে একই অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ এই তিনটি শব্দকেই বাংলায় 'ক্রীড়া' বলা হয়। কিন্তু এই

ইংরাজী তিনটি শব্দ আলাদা আলাদা অর্থ বহন করে। উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে ইংরাজীতে 'Play' বলা হয়, Game বা Sports নয়। "ক্রীড়া যখন আইনকানুনের বাঁধনে, নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট এলাকা, নির্দিষ্ট সংখ্যার চৌহদ্দিতে বাঁধা পড়ে তখন তাকে 'গেম' বলা হয়। এখানে স্বতঃস্ফূর্ততা দমিত হয়, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা খর্ব হয়। বাঁধাবন্ধনহীন ক্রিয়াকলাপ আর সারল্যের পরিবর্তে ক্রীড়ায় সাংগঠনিক জটিলতা, আর নিয়মকানুনের শাসন দেখা দেয়। 'গেম' যতই বিস্তৃতি লাভ করেছে, ততই জটিলতা বেড়েছে, সাংগঠনিক ব্যাপকতা ও প্রতিযোগিতার প্রাধান্য দেখা দিয়েছে। বহু ব্যক্তি ও বিষয়ের আনুষঙ্গিক সংযোজন ঘটেছে। এই ব্যাপক, জটিল, প্রতিযোগিতা প্রধান খেলার আনুষঙ্গিক সংযোজনের যে নব রূপান্তর ঘটেছে তারই নাম 'স্পোর্টস'। স্পোর্টসের সাংগঠনিক ব্যাপকতা এবং প্রতিযোগিতা প্রাধান্য স্পোর্টসকে 'গেম' এবং 'প্লে' থেকে বিশিষ্ট করেছে। 'স্পোর্টস'-এ প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য দরকার অতি উচ্চ মানের ক্রীড়া দক্ষতা। আর দক্ষতার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, শিক্ষণ এবং অনুশীলন। 'গেম' এর দক্ষতা অর্জনের শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল সহজ সাধাসিধে। স্পোর্টস এর দক্ষতা শিক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে কঠোর ছকে বাধা, আনুষ্ঠানিক ও টেকনোলজি সমৃদ্ধ। ইংরাজী এই শব্দ তিনটিকে অর্থাৎ 'Play', 'Game' এবং 'Sports' কে বাংলায় আমরা 'স্বাভাবিক খেলা', 'সাধারণ সংগঠিত খেলা' এবং 'অতি সংগঠিত খেলা' বলে উল্লেখ করতে পারি।"[৮] লোকক্রীড়াগুলিকে আমরা স্বাভাবিক ও সাধারণ খেলার মধ্যবর্তী স্থানে ভাবতে পারি।

ক্রীড়া দর্শন ঃ

অবসর সময় আনন্দদায়ক এবং সৃষ্টিমূলক কাজের মধ্যে নিযুক্ত থাকার প্রবৃত্তি থেকেই খেলার সৃষ্টি। দার্শনিকেরা জীবনের ধারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক দর্শন তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন - যা শরীরচর্চা ও খেলার যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। স্বতঃস্ফূর্ততা তত্ত্ব অনুযায়ী যদি খেলা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতেই খেলার পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হয়েছিল। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, অতি প্রাচীন কালে যারা নতুন নতুন খেলার সৃষ্টি করেছেন তাদেরও একটি দর্শন ছিল। ঐতিহাসিক তথ্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং নীতির উপর ভিত্তি করে তাঁরাও একটি দর্শন তৈরী করেছিলেন। তার ভিত্তিতেই তাঁরা প্রাচীন অলিম্পিকের মত এত বড় মাপের ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি ছোট ছোট গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলি অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকত— ভূমি ও সম্পদের বৃদ্ধি ও রক্ষার তাগিদে। কথিত আছে ডেলফির এক সন্ন্যাসী এই নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়াসে প্রতিযোগিতামূলক খেলার উদ্ভাবন করেন। নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। খেলার মধ্যেও এই প্রবৃত্তি বেশ কিছুটা কাজ করে। তাই খেলার মাঠে বিজয়ীরও যুদ্ধে বিজয়ীর মত আস্ফালন দেখা যায়।

প্রাচীন অলিম্পিকের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সমস্ত তথ্যসূত্র পাওয়া গেছে তা অনুধাবন করে ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন প্রাচীন অলিম্পিকে একাধারে যেমন শারীরিক কসরৎ,

দক্ষতা, নৈপুণ্য, ক্ষিপ্রতা নির্ভর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল তেমনি অন্যদিকে শিল্প সাহিত্যের প্রতিযোগিতারও কিছু কিছু ব্যবস্থা থাকত। এই যে যুগপৎ ক্রীড়া ও শিল্প সাহিত্যের আসর তার মধ্য থেকেও প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার একটি বিশেষ দর্শনকে উপলব্ধি করা যায়। সম্ভবতঃ সেই দর্শন বিশ্বাস করত শারীরিক সক্ষমতার বিকাশ যেমন মানুষের প্রয়োজন তেমনি মানুষের মননশীল, বৌদ্ধিক ও মেধাশক্তির বিকাশও জরুরী। এই বিশ্বাস, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চয়ই তাদের কাছে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং তার সঙ্গে মৌলিক নীতি ও মূল্যবোধ যুক্ত হয়ে একটি ভাববাদী দর্শন গড়ে উঠেছিল। এই বিশ্বাস ও দর্শনের অভিনব রূপটি আমরা দেখতে পাই গ্রীক দার্শনিকদের সেই বিখ্যাত উক্তিটিতে —

"Orandum est ut sit
Mens sana incorpore sano"

যার ইংরাজী অনুবাদ "Let it be prayed that there be a sound mind in a sound body."[৯] ল্যাটিন ভাষার মূল উক্তিটির ইংরাজী থেকে বাংলায় রূপান্তর করলে দাঁড়ায় — 'এস আমরা প্রার্থনা করি যেন একটি সুন্দর মন একটি সুস্থ শরীরে স্থাপিত হয়।'

কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিক (প্লেটো, সক্রেটিস), যাঁরা আদর্শবাদে বিশ্বাসী তাঁরা দেখিয়েছেন মানুষের জীবন শুধুমাত্র একটি জৈবিক সত্তাই নয়, মানস ও তার অন্তঃপ্রকৃতির সমন্বয়ে একটা পূর্ণ জীবন বা একক। সুন্দর শরীরের পূজারী ছিলেন গ্রীকরা, তাঁরা বিশ্বাস করতেন মানুষের শরীর হবে আকর্ষণীয়, শক্তির আধার, পেশীবহুল, ব্যক্তিত্বপূর্ণ। অ্যারিস্টটল এর সঙ্গে মেধা, মনন এবং আত্মিক শক্তিকেও যুক্ত করেছিলেন। আদর্শবাদীরা বিশ্বাস করেন শারীরিক ক্রীয়াকর্মের মধ্যেও একটা আদর্শ থাকবে যার দ্বারা মানুষ তার লক্ষ্য স্থির করবে সে খেলাই হোক বা জীবনের অন্য ক্রিয়াকর্মই হোক। এই আদর্শ তৈরী হবে বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও স্বকীয় শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে।

বাস্তববাদে বিশ্বাসী দার্শনিকেরা জীবনকে বৈজ্ঞানিক সত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নৈসর্গিক রূপ বলে বর্ণনা করেছেন, যা বিমূর্ত নয়। মানুষের সমস্ত কাজ কর্মের মধ্যে একটা লক্ষ্য থাকে এবং তার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই সে সেই কাজ করে। খেলাধূলা এর ব্যতিক্রম নয়। প্রয়োগবাদে বিশ্বাসীরা (জন ডিওয়ে ও অন্যান্যরা) মনে করেন জীবন অভিজ্ঞতার ফসল। জীবন সক্রিয় ও সতত পরিবর্তনশীল। গতিময় জীবনে অভিজ্ঞতাই নির্ণায়ক শক্তি। জীবনধারনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত মানুষ প্রতিক্রিয়ার বলগুলির সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে তার পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। খেলাধূলার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতা তাকে নিত্য নতুন কিছু শিখতে সাহায্য করে। তেমনি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার ইচ্ছাতেই সে নিজেকে নিযুক্ত করে। জীবনের পরিবর্তনের ইচ্ছা থেকেই খেলার মধ্যে নিহিত গতিময় পরিবর্তনশীল প্রকৃতি তাকে আকর্ষণ করে। মানুষ নিজেকে সত্যের মুখোমুখি বসিয়ে অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়।[৫,১০,১১,১২]

ক্রীড়া তত্ত্ব ঃ

ক্রীড়ার সংজ্ঞা বা ক্রীড়া কি সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন

জাগে, শিশুরা কেন খেলে বা মানুষ কেন খেলে? এ প্রশ্ন অতীতে দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মনেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা বিভিন্ন ভাবে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যাগুলি তাঁরা তত্ত্বের মাধ্যমে আলোচনা করেছেন। এই ক্রীড়া তত্ত্বগুলি আলোচনা করলে উক্ত প্রশ্নের উত্তরগুলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে যে ক্রীড়া তত্ত্বগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল—

ক) অতিরিক্ত জীবনী শক্তির তত্ত্ব বা Surplus Energy Theory.
খ) ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির তত্ত্ব বা Anticipatory Theory.
গ) বিনোদনমূলক তত্ত্ব বা Recreative Theory.
ঘ) পুনরানুষ্ঠানের তত্ত্ব বা Recapitulatory Theory.
ঙ) বিরেচন তত্ত্ব বা Cathartic Theory.
চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব বা Rivalry Theory.
ছ) জীবন সক্রিয়তার তত্ত্ব বা Theory of Life Activity.

(ক) অতিরিক্ত জীবনী শক্তির তত্ত্ব (Surplus Energy Theory) ঃ

জার্মান কবি শিলার (Schiller) ও ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সর (Herbert Spencer) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। এই তত্ত্বে ক্রীড়াকে একটি শিশুর শরীরের অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়ের মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, শিশুরা সারাদিনে নানা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে, যা তার শক্তির আধার, কিন্তু এই শক্তির সমস্তটাই শরীরের প্রয়োজনে লাগে না। তাছাড়া যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে সেই পরিমাণ পরিশ্রম যুক্ত কাজও তাদের করতে হয় না। তাই তাদের শরীরে উদ্বৃত্ত শক্তি সঞ্চিত থাকে। স্বভাবতঃই এই উদ্বৃত্ত শক্তি শিশুরা ব্যয় করে খেলার মধ্য দিয়ে। বয়স্করা তাদের অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করে জীবন যাপনের তাগিদে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। শিশুরা যেহেতু পরিশ্রম করে না তাই শিশুদের খেলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই তত্ত্বে রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের সঙ্গে একটি শিশুকে তুলনা করা হয়েছে। ইঞ্জিন যেমন বাষ্প থেকে যতটুকু শক্তি নেওয়া দরকার ততটুকুই নেয়, বাকিটা ছেড়ে দেয়, তেমনি শিশুও খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি রেখে বাকিটুকু খেলার মাধ্যমে ছেড়ে দেয়।

আধুনিক মনোবিদরা এই তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ এই তত্ত্বে ক্রীড়াকে একটি যান্ত্রিক বিষয় বলে মনে করা হয়েছে। এর স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দদায়ক ও সৃজণাত্মক দিকগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ শিশুরা ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত হলেও খেলা চালিয়ে যায়। অর্থাৎ অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করার অবস্থা না থাকলেও খেলে। যদি খেলা অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়ের মাধ্যমই হবে, তাহলে পরিশ্রান্ত অবস্থায় খেলে কেন? অসুস্থ শিশু রোগ শয্যায় খেলে কেন? তৃতীয়তঃ এই তত্ত্বে বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বয়স্ক ব্যক্তিরা পরিশ্রমের মাধ্যমে সমস্ত শক্তি ব্যয় করে। কিন্তু পরিশ্রম করা সত্ত্বেও বা সমস্ত শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও তাঁরা খেলায় অংশগ্রহণ করেন কেন? উক্ত প্রশ্নগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের প্রবক্তারা দেননি। স্বভাবতঃই এই তত্ত্বটি উপযুক্ত বলে গ্রহণ করা যায় না।[১৩]

(খ) ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির তত্ত্ব (Anticipatory Theory) ঃ

সুইস মনোবিজ্ঞানী কার্ল গ্রুজ (Carl Groose) তাঁর "The Play of Animal" এবং "The Play of Man" গ্রন্থ দুটিতে এই তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। তিনি খেলাকে ভবিষ্যৎ জীবনের মহড়া বলে উল্লেখ করেছেন। শৈশবে আমরা তেমন কোন জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনা বা দায়িত্বভার গ্রহণ করিনা। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই আমরা ভবিষ্যৎ সংগ্রাম বহুল জীবনের মহড়া দিই খেলার মাধ্যমে। ভবিষ্যতে ইঁদুর ধরতে হবে বলেই বিড়ালছানা বলের উপর ঝাঁপ দেয়। রান্নাবান্নার কাজ করতে হবে বলেই বালিকারা খেলনাবাটি খেলে। মেয়েরা পুতুলকে স্নান করায়, যত্ন করে ভবিষ্যতে মাতৃজীবন পালন করতে হবে বলেই। বালকেরা ভবিষ্যতে সৈনিক হবার জন্য যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে।

এই তত্ত্বও সার্বিক গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই তত্ত্বে শুধুমাত্র শিশুদের খেলার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বয়স্কদের খেলার ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। বয়স্কদের প্রস্তুতির কোন প্রসঙ্গ ওঠে না বলেই হয়তো নেই। দ্বিতীয়তঃ খেলাকে ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির মহড়া বলা হয়েছে। ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে শিশুদের কতটুকু ধারণা থাকে? তৃতীয়তঃ প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্রীড়ার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে না এমন খেলা শিশুরা খেলে কেন? যেমন - ক্যাচ ধরা বা নৃত্য করা। স্বভাবতঃই এই তত্ত্ব পুরোপুরি ত্রুটি মুক্ত নয়। এই তত্ত্বে শিশুর মানবিক ও মনোস্তাত্ত্বিক দিকটি উপেক্ষা করা হয়েছে।[১৪]

(গ) বিনোদনমূলক তত্ত্ব (Recreative Theory) ঃ

জার্মান দার্শনিক ল্যাজারস (Lazarus) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি মনে করেন নানা প্রকার কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের যে শক্তি ব্যয় হয়, খেলা সেই ব্যয়িত শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে। বিভিন্ন মনোবিদ একথা স্বীকার করেছেন যে, কাজের প্রকৃতির পরিবর্তন মানসিক অবসাদ কমায়। এদিক থেকে এই তত্ত্বের সত্যতা আছে। কারণ কাজের পর খেলায় অংশগ্রহণ অর্থাৎ কাজের প্রকৃতির পরিবর্তন আমাদের অবসাদ, ক্লান্তি, একঘেয়েমি দুর করে এবং উপযোগী মানসিকতা গড়ে তোলে।

এই তত্ত্ব আংশিক সত্য হলেও পুরোপুরি নয়। কারণ শুধুমাত্র খেলার মধ্য দিয়েই শক্তির পুনরুজ্জীবন হয় একথা মনে হয় সত্য নয়। ঘুম বা বিশ্রামের মাধ্যমেও হতে পারে। ঘুম বা বিশ্রামের মাধ্যমে হয় না কেন তার ব্যাখ্যা তিনি দেননি। দ্বিতীয়তঃ কাজের এবং দেহের অঙ্গের পরিবর্তন হলেই অবসাদ দূর হবে। দেখা গেছে শিশুর অঙ্গের অবসাদ আসা সত্ত্বেও সেই অঙ্গই শিশু খেলার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করছে। স্বভাবতঃই অবসাদ দূরীকরণের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা অসম্পূর্ণ। সুতরাং অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে এই তত্ত্ব সার্বিক বলে প্রমাণিত হয় না।[৫]

(ঘ) পুনরানুষ্ঠানের তত্ত্ব (Recapitulatory Theory) ঃ

স্ট্যানলি হল (Stanley Hall) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। এটি ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি তত্ত্বের ঠিক বিপরীত তত্ত্ব। তিনি বলেছেন মানুষ ফেলে আসা অতীত জীবনকেই খেলার মাধ্যমে তুলে ধরে। শিশুরা তার খেলার মধ্য দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারণ পুনরাবৃত্তি করে।

লুকোচুরি খেলা, মাছ ধরা খেলা, গুহা বানানো খেলা যেগুলি সবই আদিম যুগের মানুষদের জীবনধারণের উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ আচরণ। তিনি মনে করেন বর্তমানে আমরা অনেক অতীত আচরণ ত্যাগ করেছি। কিন্তু অতীতকে না জানলে বর্তমানকে জানা যাবে না। খেলার মধ্য দিয়ে অতীত সভ্যতার বিভিন্ন পরিত্যক্ত কাজের আমরা পুনরাবৃত্তি করি।

এই তত্ত্বের অনেকখানি সত্যতা থাকলেও সর্বৈব সত্য নয়। কারণ খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা কেন অতীত কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি করতে চায় তার ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য 'স্বাধীনতা' এই তত্ত্বে উপেক্ষা করা হয়েছে। বলা হয়েছে খেলার প্রকৃতি সমাজের ইতিহাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর নিয়ন্ত্রিত হলেই স্বাধীনতা লোপ পায়। খেলা হয়ে দাঁড়ায় গতানুগতিক। তৃতীয়তঃ এই তত্ত্বে বংশগতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভালো গায়কের ছেলে ভালো গায়ক হবে। বাস্তবে কি তা হয়? স্বভাবতঃই এই তত্ত্ব সার্বিক গ্রহণযোগ্য নয়।[৫]

(ঙ) বিরেচন তত্ত্ব (Cathartic Theory) ঃ

মনোবিদ ফ্রয়েডের (Freud) তত্ত্ব অনুসারে সৃষ্টি হয়েছে বিরেচন তত্ত্ব। মনোবিদ জেমস রস (James Ross) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। ডাক্তারী পরিভাষায় 'ক্যাথারসিস্' শব্দের অর্থ— অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার পদ্ধতি। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে খেলা হচ্ছে শরীরের ময়লা পরিষ্কারের মাধ্যম। খেল'র মাধ্যমে আমরা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে পারি।

খেলার এই তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর সত্যতা কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তথাপি এই তত্ত্বে খেলার মত একটি পবিত্র বিষয়কে অপবিত্র করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশু যাদের অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তার লাভ করেনি, পিতামাতার স্নেহের ছায়ায় মানুষ তাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কি থাকতে পারে? স্বভাবতঃই এই তত্ত্ব দ্বারা খেলাকে ব্যাখা করা যায় না।[৪]

(চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব (Rivalry Theory) ঃ

বিখ্যাত মনোবিদ ম্যাক্‌ডুগাল (Mcdougall) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি মনে করেন, মানুষ কতকগুলি জন্মগত প্রবণতার অধিকারী এবং বিশেষভাবে শৈশবের বেশীরভাগ আচরণই সেই প্রবণতা দ্বারা চালিত। ম্যাক্‌ডুগাল বলেন, সমস্ত শিশুই যখন খেলে তখন নিশ্চয়ই তাদের কোন প্রবণতা আছে। এই প্রবণতাকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা (Propensity of rivalry) বলে উল্লেখ করেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা থেকেই খেলার প্রকাশ বলে তিনি মনে করেন। প্রশ্ন জাগে, খেলার মধ্যে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা আছে তখন খেলা মানেই সাথীদের সঙ্গে মারামারি। ম্যাক্‌ডুগাল উত্তরে বলেছেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা ও যুযুৎসুর প্রবণতা (Combative instinct) আলাদা। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে আত্মবিকাশের চেষ্টা আছে, কিন্তু যুযুৎসুর মধ্যে আছে শত্রুকে ঘায়েল করার প্রবৃত্তি।

এই তত্ত্বটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সব খেলার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের দ্বারা দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক মনোবিদরা মনে করেন খেলা কোন বিশেষ প্রবৃত্তির

দ্বারা চালিত নয়, খেলার মধ্য দিয়ে প্রবৃত্তিগত চাহিদা চরিতার্থ হয়।[8]

(ছ) জীবন সক্রিয়তার তত্ত্ব (Theory of Life Activity) ঃ

ডিউই, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাবিদরা এই তত্ত্বের সমর্থক। ডিউই-এর মতে — "Life is by product of activities." অর্থাৎ সক্রিয়তাই জীবনের ধর্ম। খেলাকে জীবন-সক্রিয়তার একটি বিশেষ ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করেছেন। সক্রিয়তাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যহীন। কাজকে তিনি উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয়তা এবং খেলাকে উদ্দেশ্যহীন সক্রিয়তা বলে উল্লেখ করেছেন। ফ্রয়েবেল বলেছেন, খেলার মাধ্যমে শিশুর আত্মসক্রিয়তার প্রকাশ ঘটে।

এই তত্ত্ব আংশিক সত্য। কারণ এই তত্ত্বে ব্যবহারিক দিকের থেকে দার্শনিক দিকের প্রতি বেশী আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই তত্ত্বে খেলার অস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।[8]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কোন তত্ত্বই একক ভাবে সঠিক বা পূর্ণাঙ্গ নয়। প্রত্যেকটি তত্ত্বের মধ্যেই কিছু ত্রুটি বর্তমান। কোনটিই ত্রুটি মুক্ত নয়। আবার কোনটিই একেবারে গ্রহণযোগ্য নয় একথা বলা যাবে না। কারণ প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু সত্যতা আছে। আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায়, চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই অপূর্ণতার মূল কারণ। অতিরিক্ত জীবনী শক্তির তত্ত্বের সঙ্গে শুধুমাত্র দৈহিক শক্তি না বলে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত শক্তি হিসাবে যদি বিবেচনা করি তাহলে বিরেচনবাদের তত্ত্বের সঙ্গে সহজেই সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। আবার বিরেচনবাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির তত্ত্বের সামঞ্জস্য আনয়ন করা সম্ভব — যদি আমরা মেনে নিই আদিম প্রবৃত্তির তাগিদেই আমরা খেলা করি এবং খেলার মাধ্যমেই সেগুলিকে চরিতার্থ করি। মারামারি করা আদিম প্রবৃত্তি তাই খেলার মধ্যে আমরা যুদ্ধ করি। আবার পুনরানুষ্ঠানের তত্ত্বের সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি তত্ত্বের কোন বিরোধ থাকে না যদি আমরা মেনে নিই জীবন ধারণের জন্য অতীতের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের প্রস্তুতি দুই-ই প্রয়োজন। সব কিছুর মূলেই আছে জীবন সক্রিয়তার তত্ত্ব। শিক্ষাবিদ নান (Nunn) একথাই বলেছেন। পরিশেষে বলা যায় - খেলার বিভিন্ন তত্ত্বগুলির স্বার্থক সমন্বয়ই খেলার প্রকৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।[8]

ক্রীড়া ও শরীর চর্চার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

ক্রীড়া ও শরীর চর্চাকে জানতে হলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন তার অতীত ইতিহাস। কারণ অতীতকে না জানলে বর্তমানকে জানা সম্ভব নয়। যদিও অতীত যুগের মানব সভ্যতার ইতিহাস অনেকটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই যুগের লোকেদের অজ্ঞাতসারে রেখে যাওয়া জীবন ধারার কিছু চিহ্ন তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতবাহী সূত্র যা ঐতিহাসিক উপাদান। কিছু আদিবাসী ও কিছু অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালীও আমাদেরকে অতীতকে জানতে সাহায্য করে। স্পেনের আলতামিরা পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে আঁকা কিছু ছবি থেকেও আদিম যুগের মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালীর কিছু আভাস পাওয়া যায়। তার

ফলেই জানতে পারা যায় মানুষের বাসস্থানের কথা, আত্মরক্ষার কথা, খাদ্যান্বেষনের কথা। আত্মরক্ষা ও খাদ্যান্বেষণই ছিল মানুষের সর্বপ্রধান কাজ। আর এ জন্য প্রয়োজন ছিল শারীরিক সক্ষমতার। বন্য জন্তুর তাড়া খেয়ে প্রাণপনে দৌড়, লাফ দিয়ে খানাখন্দ পার হওয়া, পাথরের ধারালো অস্ত্র নিক্ষেপ করে তাদের সঙ্গে লড়াই করা এসবই ছিল আদিম অধিবাসীদের জীবন যাপনের অঙ্গ। মানুষের জীবন ছিল সংগ্রামে ভরা। আর এই সংগ্রাম ছিল পুরোপুরি শরীর নির্ভর। শারীরিক কসরৎ, কৌশল ও চর্চার মধ্য দিয়েই সে নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছিল, অন্যান্য জীব জন্তুদের উপর প্রভূত্ব স্থাপন করে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। তার জীবনের সব কিছুই ছিল শরীর নির্ভর।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে জানতে পারা যায়, বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খেলাধূলা ও শরীরচর্চা করত। কোন দেশ শরীরকে সুন্দর, সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দেহ তৈরীর কাজে, কেউবা দেশ রক্ষার প্রয়োজনে। সুন্দরের উপাসকরা জিমন্যাস্টিক্স ও অ্যাথলেটিক্স এর প্রতি গুরুত্ব দিত সর্বাধিক। আর দেশ রক্ষকরা শক্তিশালী ও সাহসী সৈন্যদল গঠনের উদ্দেশ্যে বর্শা নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ, দলবদ্ধ মার্চিং, রথচালনা, শিকার, কুস্তি ইত্যাদি শরীর চর্চার মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিল।

ভারতবর্ষেও আদিমকাল থেকে খেলাধূলা ও শরীরচর্চার একটি বিশেষ স্থান ছিল। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে সিন্ধু সভ্যতার সময়ে শরীর চর্চার কিছু স্পষ্ট ছবি পরিলক্ষিত হয়। মহেঞ্জোদড়োর মাটির নীচে একটি বিশাল স্নানাগার আবিষ্কৃত হয় — যা দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট ও প্রস্থে ১০৮ ফুট। স্নানার্থীদের পরিচ্ছদ পরিবর্তনের জন্য পৃথক কক্ষ ছিল এবং তলা পর্যন্ত সিঁড়ি ছিল, যা দেখতে আধুনিক সুইমিং পুলের মত। চতুর্দিকে বসার জন্য গ্যালারীর মত স্থায়ী আসন ছিল। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে তৎকালে সাঁতার বা কোন জলক্রীড়া অভিপ্রদর্শন বা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। শিশুদের খেলার জন্য মাটির তৈরী নানা আকৃতির পাখী ও বাঁশী পাওয়া গেছে। শিকার, যুদ্ধবিদ্যা প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্য কর্তব্য ছিল।[১৫]

বৈদিক যুগেও শরীর চর্চা ও খেলাধূলার বহুল প্রচলন ছিল। আর্যরা প্রাণশক্তি ও সাহসিকতায় পূর্ণ ছিল। ধনুর্বিদ্যা, মার্বেল খেলা, ঘোড় দৌড়, রথ চালনা ছিল তাদের সাধারণ খেলাধূলা। খেলাধূলাকে তারা শুধুমাত্র আনন্দের মাধ্যম হিসাবে নয়, যুদ্ধের মহড়া হিসাবে গ্রহণ করেছিল। লাঠিখেলা, তরবারি চাল্লনা, মুষ্টিযুদ্ধ, হস্তি ও অশ্বারোহণ পদচারণা প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। লাঠি ও অসি খেলা, মল্লক্রীড়া, রথ চালানো, খেলার সঙ্গীকে বেগে ধাওয়া করা প্রভৃতি খেলা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। হাতি ও ষাঁড়ের পিঠে চড়ে দৌড় দুটি ছিল অভিনব প্রতিযোগিতা। একটি অতি প্রাচীন খেলা ছোট ও বড় দুই রকম লাঠি ও বল দিয়ে বালকেরা খেলতো। এই খেলার নাম ছিল "কিট্টিপুল"। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার নাম ছিল "জাল্লিকাটু"। একটি ঘেরা স্থানে এক যুবক ও এক ষাঁড়ের খেলা। ছোট বালকদের প্রিয় খেলা ছিল চাকাওয়ালা কাঠের গাড়ী দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া, গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাওয়া, সাঁতার কাটা ইত্যাদি।[১৫,১৬]

প্রাচীন হিন্দু যুগের শরীর চর্চা ও খেলাধূলার অনেক পরিচয় পওয়া যায় রামায়ণ ও মহাভারতে। তাছাড়া পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রন্থেও তৎকালীন সমাজের শরীর চর্চা ও খেলাধূলার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। দাস (১৯৮৫)[১৬] একটি গ্রন্থে লিখেছেন যে, রামায়ণে সে যুগের বীরদের ধনুর্বিদ্যা, মল্লযুদ্ধ এবং ভারী যুদ্ধাস্ত্রে পারদর্শিতার উল্লেখ আছে। গুরু দ্রোণাচার্যের ধনুর্বিদ্যা ও যুদ্ধাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা আমরা সবাই জানি। অর্জুনের ধনুর্বিদ্যায় লক্ষ্য ভেদের কথা আমরা মহাভারতের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে দেখতে পাই। ধনুর্বিদ্যাকে অর্জুন শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবদের শারীরিক শক্তির দক্ষতার, সমন্বয় ও ভারসাম্যের অভাবনীয় উন্নতি আমরা দেখতে পাই মহাভারতে। লাঠি চালনা, রথ চালনা, মল্লযুদ্ধ, জলক্রীড়া প্রভৃতি ছিল সে যুগের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের অন্যতম অংশ। মাকন্দপুরাণ ও হরিবংশপুরাণ নামক সংস্কৃত সাহিত্যে ডিসকাস প্রতিযোগিতা, পাথর ছোঁড়া প্রতিযোগিতা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৭] মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা প্রাচীন ভারতে এক বিশেষ জায়গায় পৌঁছেছিল। 'কথাসরিৎ সাগর' নামক এক প্রাচীন গ্রন্থে অশোক দত্তা নামক এক যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন এবং বিখ্যাত হয়েছিলেন।[১৮]

বিল (Beal-1875) তাঁর "The Romantic Legend of Sakya Buddha" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বৌদ্ধ যুগেও সামরিক ও শরীর চর্চার প্রচলন ছিল। গৌতম বুদ্ধ নিজে অন্যান্য রাজপুতদের সঙ্গে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সে যুগে কান্তাদেব (Kantadeva) একজন বিখ্যাত সমরবিদ ছিলেন। জাতকের গল্পে বিভিন্ন প্রকার শরীর চর্চার নমুনা পাওয়া যায় — যেগুলি বেশীর ভাগ মানুষ অভ্যাস করত। ধনুর্বিদ্যা সে যুগে খুব আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। পাশাপাশি মল্লযুদ্ধ, শিকার, জলক্রীড়া, নৃত্য, মিউজিক, ফেন্সিং ইত্যাদি বিনোদনমূলক খেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৯]

ললিতা বিস্ত্রা (Lalita Vistara) তাঁর গ্রন্থে সে যুগের শরীর চর্চা এবং খেলাধূলার কথা উল্লেখ করেছেন। লাফ, লিপিং, ভল্টিং, ডাইভিং, নৌকাচালনা, হাতি ও ঘোড়ার পিঠে চড়ে দৌড়, যোগাসন, লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত করা প্রভৃতি খেলা সে যুগের মানুষেরা নিয়মিত চর্চা করত।[২০]

পরবর্তী হিন্দু যুগে (৩২০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির এক অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তক্ষশীলা, নালন্দা ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলি এ যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষ অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন রাজ্যে গুপ্ত, বর্দ্ধন, পাল, চালুক্য, রাষ্ট্রকুট ও চোল রাজারা রাজত্ব শুরু করেন। এই সময় শরীর চর্চা ও খেলাধূলা এক বিশেষ জায়গা করে নেয়। প্রায় ৭০টি রাজ্য নালন্দা ও তক্ষশীলাকে সাধারণ শিক্ষার (দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত) পাশাপাশি সামরিক শিক্ষার (অশ্বারোহণ, ধনুর্বিদ্যা, সাঁতার, মল্লযুদ্ধ, অসিচালনা) কেন্দ্র হিসাবে মেনে নেয়। এ যুগে মেয়েদের শারীরিক ক্রিয়া কর্মও ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ যুগের মেয়েরা ধনুর্বিদ্যা, তরবারি চালনা, ঘোড়ায় চড়া ও লোকনৃত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।[২১]

এ যুগের বেশ কিছু দার্শনিক, লেখক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁরা শরীর চর্চা ও খেলাধূলাকে বিশেষ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাণভট্টের বিখ্যাত

'কাদম্বরী' গ্রন্থে ধনুর্বিদ্যা, ডিসকাস, তরবারি চালনা প্রভৃতি প্রশিক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস তাঁর "কুমারসম্ভব" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 'সুন্দর শরীর সুন্দর স্বাস্থ্য গঠনে সহায়ক' একথা উল্লেখ করেছেন। সুশ্রুত (Susruts) সর্বপ্রথম শারীরিক ব্যায়াম ও শারীরিক কার্যক্রমকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন — "Physical exercise is nothing but a sense of weariness from bodily labour and it should be taken every day". সুশ্রুত শারীরিক ব্যায়াম (Physical Exercise) ও অন্যান্য শারীরিক কার্যক্রমকে (Physical Activity) কিছু রোগের উপশম (Therapy) হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। চালুক্য রাজ তৃতীয় সমেশ্বরা (Someswara III ; 1126-1137 AD) সামরিক ও শরীর চর্চা বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তিনি উপকরণ সহ প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতেন। বিশেষ করে ছোরা, বর্ম, বল্লম, তীর, ধনুক ইত্যাদি। মল্লযুদ্ধ, যোগাসন ও সাঁতার নিয়মিত অভ্যাসের বিষয় ছিল।[২২]

মুসলিম যুগে (১২০০-১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) শরীর চর্চা ও খেলাধূলাকে ততোধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পৃথ্বিরাজ চৌহানের পরাজয়ের পর মুসলিম শাসকরা স্থায়ী ভাবে রাজত্ব শুরু করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— দাস (১২০৬-১২৯০), খিলজি (১২৯০-১৩২০), তুঘলক (১৩২০-১৪১৪), সৈয়দ (১৪১৪-১৪৫১), লোধী (১৪৫১-১৫২৬) এবং মোঘল (১৫২৬-১৭৫৭)। এই শাসকদের মধ্যে মোঘল শাসকরা ছিল অন্যতম। মোঘল শাসকদের মধ্যে সম্রাট আকবর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। আবুল ফজল ও এডওয়ার্ড টোরির লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এ যুগে খেলাধূলার তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি। তবে শিকার, চৌঘান খেলা (যা বর্তমানের পোলো খেলার মত), তাস, দাবা, চৌপর (বর্তমানের লুডো খেলার মত), পাঁচিশি প্রভৃতি খেলাগুলি বহুল প্রচলিত ছিল, মূলতঃ অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। মল্লযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন ছিল। সম্রাট বাবর, হুমায়ুন ও আকবর সাঁতার ও অশ্বচালনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 'চৌঘান' নামক খেলাটি সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল। এই খেলায় শারীরিক সক্ষমতা খুব উচ্চ মানের প্রয়োজন ছিল।[১৫]

ইংরেজ জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, যেখানেই তারা সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ হাত প্রসারিত করেছে, সেখানেই তারা প্রচলিত করেছে খেলাধূলা ও শরীর চর্চা। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই খেলাধূলা ও শরীর চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল ইংরেজ পরিচালিত বিদ্যালয় গুলিতে ও ভারতের অভিজাত শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের মধ্যে। ড্রিল, মার্চিং, জিমন্যাস্টিক্স, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি এই খেলাগুলি এ যুগে বহুল প্রচলিত ছিল। দেহগঠন ও আনন্দদানের জন্য ব্যায়াম ও খেলাধূলাব ব্যবস্থা ছিল। এ যুগে ভারতবাসীরা স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসকদের উচ্ছেদের জন্য এবং দেশ প্রেমের আবেগ থেকে তাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা গিয়েছিল শরীর চর্চার মাধ্যমে শক্ত সামর্থ দেহ গঠনের। যুব সমাজে শরীর চর্চার অধিক প্রবণতা থেকেই গঠিত হয়েছিল আখড়া। এই আখড়াগুলি একাধারে শরীরচর্চা অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল।[১৫] স্বভাবতঃই ক্রীড়া ও শরীর চর্চার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সন্দেহাতীত ভাবেই রয়েছে।

লোকক্রীড়ার সংজ্ঞা সন্ধান ঃ

ক্রীড়ার সংজ্ঞা, তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রীড়ার নানা প্রকার উপযোগিতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া গেছে। ক্রীড়া আনন্দ দেয়, ক্লান্তি দূর করে, জীব শিশুকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে, সর্বোপরি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিরাট সামাজিক ভূমিকা পালন করে। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া এক সময় মানব সমাজের সংস্কৃতির অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। আর 'সমাজ' ও 'সংস্কৃতি' কখনোই বিচ্ছিন্ন নয়, অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। "সংস্কৃতি বলতে আজ আর শুধু সঙ্গীত, চিত্র, গল্পোপন্যাসকেই বোঝায় না। এই সিদ্ধান্ত আজ সকলেরই জ্ঞাত আছে যে জীবন যাপনের রূপরীতির সমস্তটুকুই সংস্কৃতির বিষয়বস্তু। আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, বিশ্বাস-সংস্কার, শোক-তাপ, আমোদ-আহ্লাদ, ধর্ম-বিশ্বাস ইত্যাদি জীবন চর্চা ও জীবন চর্যার যাবতীয় কিছুরই বহিঃপ্রকাশের রূপ রীতিই হল সংস্কৃতি। এই বিচারে মানুষের খেলাধূলাও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। খেলাধূলা মানুষের জীবনে যে কী গভীর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা বুঝতে পারি যখন দেখি আড়াই তিন হাজার বছর আগে গ্রীস, রোম প্রভৃতি অগ্রগণ্য সভ্য দেশগুলিতে খেলাধূলাকে ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে খেলাধূলাকে নিতান্তই শৈশব চাপল্য হিসাবে নির্বাসিত করা যায় না।"[২৩] সংস্কৃতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — লোকসংস্কৃতি ও শিষ্ট সংস্কৃতি। ক্রীড়াকেও লোকক্রীড়া ও শিষ্ট ক্রীড়া এই দুটি ভাগে বিভাজন করা যায়। শিষ্ট ক্রীড়া বলতে যে ক্রীড়াগুলি বিভিন্ন সমাজে, অঞ্চলে সর্বোপরি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই নিয়মনীতিতে অনুষ্ঠিত হয় সেই ক্রীড়া গুলিকে বোঝায় যেমন- ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি। আর লোকক্রীড়া বলতে যে ক্রীড়াগুলি মূলতঃ গ্রাম্য পরিমণ্ডলে উদ্ভূত, বিভিন্ন সমাজে, অঞ্চলে এবং বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মনীতিতে অনুষ্ঠিত হয় সেই ক্রীড়াগুলিকে বোঝায় - যেমন গোল্লাছুট, কানামাছি, গাদি, ডাংগুলি ইত্যাদি, যে ক্রীড়াগুলি বঙ্গ সংস্কৃতিকে বা বাংলার লোকসংস্কৃতিকে জানতে হলে একান্ত অপরিহার্য। এই ক্রীড়াগুলি আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে ফেলে আসা অতীতের অনেক স্মৃতির সন্ধান পাওয়া যায় ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনকে জানতে পারা যায়।

বিভিন্ন আলোচক লোকক্রীড়া সম্পর্কে খুবই মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় লোকক্রীড়া গুলির সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও লোকক্রীড়ার পরিচয় জ্ঞাপক আলোচনায় যত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, লোকক্রীড়ার গ্রহণযোগ্য কোন সংজ্ঞার প্রতি তেমন গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়নি। ড. অসীম দাস বলেছেন, "ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ভলি প্রভৃতি ক্রীড়াগুলির আমাদের দেশেও রূপরীতির ব্যতিক্রম নেই। এই ক্রীড়াগুলিকে উপভোগ করবার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে ইকির মিকির, ডাংগুলি, হাডুডু, গাদি, বৌবাসন্তী প্রভৃতি ক্রীড়াগুলি এক এক অঞ্চলে এক এক রূপরীতিতে খেলা হয়। এক অঞ্চলের নিয়মকানুন অন্য অঞ্চলের মনঃপূত নয়। এই জাতীয় ক্রীড়াগুলিকেই আমরা লৌকিক ক্রীড়া বলতে চাই।"[২৪] বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ গ্রন্থে এর সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলা হয়েছে — "...প্রাচীন খেলাধূলা যা মানুষের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে, যা প্রাতিষ্ঠানিক অনমনীয়

নিয়মকানুনের মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রসারিত হয় না, মানুষের জীবন চর্চার মধ্য দিয়ে এক যুগ থেকে অন্য যুগে সঞ্চারিত হয়ে যায়, যা জীবনের অনুকৃতির প্রতীকিরূপ এবং যার মধ্যে ফ্যান্টাসী ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি সেই ক্রীড়াগুলিই লোকক্রীড়া।"[২৫] অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেছেন, 'আঞ্চলিকতার পরিচয় বিশিষ্ট, সহজলভ্য উপকরণ নির্ভর অথবা উপকরণ বিহীন, ছড়া সম্পৃক্ত অথবা ছড়া বিহীন, ঐতিহ্যানুসারী যে ক্রীড়া নমনীয় নিয়মানুসারে গৃহ্যাভ্যন্তরে অথবা প্রকৃতির উষ্ণ সান্নিধ্যে অনুষ্ঠেতব্য, সাধারণভাবে যে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারীদের নিবিড় অনুশীলন অথবা শিক্ষা নবিশীর প্রয়োজন হয় না, যাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছেলে মেয়ে কিংবা উভয় লিঙ্গের খেলোয়াড়দের দৈহিক পুষ্টি অথবা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন হয়, যা আপাত ভাবে গুরুত্বহীন অথচ সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় যে খেলায় জীবনের অনুকৃতি কিংবা ফেলে আসা অতীত জীবন চর্চার পুনরভিনয় লক্ষিত হয়, যাতে আমাদের আর্থ সামাজিক ইতিহাসের প্রত্নাবশেষের সন্ধান লভ্য, তাই হল লোকক্রীড়া।"[২৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে লোকক্রীড়ার কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে — লোকক্রীড়াগুলি গ্রাম্য পরিমণ্ডলে উদ্ভূত, নিয়ম কানুনের কঠোরতা বহির্ভূত, উপকরণের প্রাচুর্য কম, চরিত্রে জটিল নয়, নির্দিষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ ও নির্দিষ্ট সময় বহির্ভূত, প্রশিক্ষক হীন, অভিনয় ধর্মী ও ছড়া ধর্মী গুণ সম্বলিত, সার্বিক অংশগ্রহণ ধর্মী ও সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক গুণ বিকাশের সহায়ক।

বিশিষ্ট সমালোচকদের আলোচনার সাবমর্ম অনুধাবন করে লোকক্রীড়ার সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় "গ্রাম্য পরিমণ্ডলে উদ্ভুত, প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরন নির্ভর বা উপকরণবিহীন, ব্যয় বহুল নয়, সকল স্থানে অনুষ্ঠেতব্য, নির্দিষ্ট পোশাক, সময়, প্রশিক্ষক ও নিয়মকানুন বহির্ভূত, সার্বিক অংশগ্রহণ ধর্মী, মানুষের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত, ফেলে আসা অতীত জীবনের অনুকৃতি সম্বলিত, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক গুণ বিকাশের সহায়ক এবং যেখানে জয় পরাজয়ের তুলনায় আনন্দই প্রধান তাকে লোকক্রীড়া বলে।"

লোকক্রীড়ার সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

লোকক্রীড়ার সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকক্রীড়াগুলি মানুষের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত এবং ফেলে আসা অতীত জীবনের অনুকৃতি সম্বলিত। অর্থাৎ এই ক্রীড়াগুলির মধ্যে অতীতের সমাজ ছবি ফুটে উঠেছে। যেগুলি আলোচনা করলে আধুনিক সভ্যতার ও সমাজ পদ্ধতিরও ক্রমবিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন লোকক্রীড়া আলোচনা করলে সেই সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে পারা যায়। এ গুলিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর জীবন যাত্রার অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "এই রকম খেলাতে আমাদের বিশেষ আনন্দ আছে ; তার কারণ এই যে, প্রয়োজন সাধনের জন্য আমরা যে সকল প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছি, প্রয়োজনের উপস্থিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে তাদের খেলায় প্রকাশ করতে পাই। ....খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি মূলে একই। এই জন্য খেলার মধ্যে জীবন যাত্রার নকল এসে পড়ে।"[২৭] শিশুরা ক্রীড়ায় বয়স্কদের জীবনযাত্রা বা কর্মকাণ্ডকে অনুকরণ করে। যেমন - যুদ্ধের অনুকৃতি হিসাবে 'মল্লক্রীড়া', 'ছোরা খেলা', 'লাঠি খেলা', গার্হস্থ্য

জীবনের অনুকৃতি হিসাবে 'পুতুল খেলা', 'রান্নাবাড়ি খেলা' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিশোরীদের মধ্যে 'পুতুল খেলা' বহুল প্রচলিত। 'পুতুল খেলা'র একটি বিশেষ দিক হল পুতুলের বিয়ে। খেলার ছলে এই বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কিশোরীদের বাস্তব জীবনের হাতে খড়ি হয়। পুতুল খেলা সম্পর্কে রায়গুণাকর ভরতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে উমার বাল্যাবস্থার জীবনযাত্রা প্রসঙ্গে বলেছেন,

'সখী - মেলি খেলিনু বাহির বাড়ি গিয়া,
ধুলো ঘবে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া।'[২৮]

আদিম গোষ্ঠী জীবনে একটি গোষ্ঠী আর একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ত। 'চিক্কাহেতেল' লোকক্রীড়ায় জমির অধিকার রক্ষা নিয়ে আদিম গোষ্ঠী জীবনের সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয়। আবার টোটেম, জাদু ইত্যাদি বিশ্বাস থেকে অনেক লোকক্রীড়ার সৃষ্টি হয়েছে। আদিম মানুষের মধ্যে একটি বিশ্বাস ছিল যে, মনুষ্যেতর কোন প্রাণীই তাদের পূর্বপুরুষ, যা টোটেম বিশ্বাসের মূল কথা। 'কুকুর শকুনি', 'বাঘছাগল' প্রভৃতি খেলার উৎস এই টোটেম বিশ্বাস।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত উপাদান বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন বিশাল আকারের শস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা ও ফসল চূর্ণ করার সরঞ্জাম। তাদের অনুমান দাস শ্রমিকদের দ্বারাই এই বিপুল কার্য সম্পাদন করা হত। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য অনুসরণ করে ড. অসীম দাস[২৯] গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সভ্যতার প্রত্ন ঐতিহাসিক জীবন চিত্রের প্রতিভাস এখনো পর্যন্ত প্রচলিত লোকক্রীড়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। 'গোল্লাছুট' লোকক্রীড়াটির মধ্যে ঐ সময়কার ফসল চূর্ণ করার এবং দাস শ্রমিকদের পাহারা দেবার অনুকৃতি পরিলক্ষিত হয়। 'সাতচাড়া' লোকক্রীড়ায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের দুর্গ রক্ষা করার অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

আদিম মানুষ যখন প্রকৃতিতে ঘটমান বিভিন্ন দুর্বিপাক যথা ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত, অতিবৃষ্টি বা খরা প্রভৃতি এবং তজ্জনিত অপরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির চিত্ত-অসাড়কারী দৃষ্টান্তের সামনে নিতান্ত মূহ্যমান বোধ করেছে তখন প্রতিকারের উপায় খুঁজে না পেয়ে তারা এ জগৎ সংসারের পিছনে একটি অদৃশ্য সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে তাকে সর্বশক্তিতে ভূষিত করে মানসিক সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেছে। ওই সর্বশক্তিমান সত্তাকে কিভাবে প্রসন্ন করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনেও সচেষ্ট হয়েছে। এই উদ্ভাবন চেষ্টা থেকেই নানাবিধ তুকতাক, জাদুক্রিয়া, অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের উদ্ভব। ফ্রেজার, ম্যাকডুগাল প্রভৃতি নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই আদিম ম্যাজিকই ধর্মের গোড়ার কথা। স্রেফ ভয় ভীতি থেকেই ধর্মের জন্ম। ভয় যে শুধুমাত্র এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পনা করেই থেমে গেছে তা নয়, তাকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে তাদের পূজায় প্রবৃত্ত হয়েছে। প্রাচীন দেবদেবীর কল্পনার এই ভাবেই সৃষ্টি।[২৯] ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, জাদুবিদ্যা এক সময় সমাজে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পায়। আর এই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অনুকৃতি হিসাবেই সৃষ্টি হয় কিছু লোকক্রীড়ার। 'ঘেটুর মাগন', 'ঢোপের খেলা', 'রোদতোলা' প্রভৃতি লোকক্রীড়াগুলি সরাসরি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা জাদুক্রিয়ার সঙ্গে

যুক্ত। মহরমের লাঠি খেলা মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি অনুষ্ঠান। আবার 'দশাবতার তাস' ও 'গোলক ধাম' ক্রীড়াদুটি সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্মের অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক। চর্যাপদে 'দাবা' খেলার উল্লেখ আছে। সেহেতু 'দাবা' খেলাটিও একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক ক্রীড়া একথা সহজেই অনুমান করা যায়। 'ঘুড়ি ওড়ানো' খেলাটি সারা পৃথিবীতেই একটি জনপ্রিয় আনন্দদায়ক খেলা। পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজো ও মকরসংক্রান্তি বা মাঘী সপ্তমী এই দুটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুড়ি ওড়ানো হয়। কোন একটি নির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠান থেকেই খেলাটির সৃষ্টি এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আদিম কাল থেকেই অন্য গোষ্ঠীর লোকেদের পরাজিত করে তাদের শ্রম থেকে ফয়দা তুলে শাসক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। শোষিতদের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার জন্য সামাজিক বিচার ও সামাজিক শাস্তি ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এই আদিম বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তিত রূপ দেখা যায় 'রাখালরাজা' 'দাসকোষ' প্রভৃতি লোকক্রীড়ায়। 'ঘুমপাতানো' খেলাটিতেও শাস্তি দানের প্রচলিত প্রথার অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

শুধু আদিম সমাজ, গোষ্ঠী সংগ্রাম, আদিম যৌনাচার ও বিবাহরীতি, জাদু সংস্কার, ধর্মীয় আচরণ অথবা বিচার এবং শাস্তি দানের প্রচলিত প্রথার অনুকৃতি থেকেই লোকক্রীড়ার সৃষ্টি, এটাই একমাত্র সত্য নয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যা কিছু কর্মকাণ্ড তাই দেখা গেছে লোকক্রীড়ার উপাদান হিসাবে। কোন একটি ঘটনা কিছু কাল পরে স্মৃতিতে ম্লান হয়ে আসে। একটা সময় আসে যখন সেই ঘটনাগুলি বিস্মৃত অতীতে পরিণত হয়। লোকক্রীড়া সেই বিস্মৃত অতীতকে বাঁচিয়ে রাখে। অতীতের কোন বিষয় যদি ক্রীড়ার মধ্যে একবার প্রচলিত হয়ে যায়, তবে যুগ-যুগান্ত ধরে তা স্মৃতিকে বহন করে নিয়ে চলে। 'গাদি' নামক লোকক্রীড়াটি সম্ভবত এমনই একটি স্মৃতিকে বহন করে নিয়ে চলেছে। লবণের কারবার একচেটিয়া ভাবে ইংরেজরা তুলে নেওয়ার ফলে বাংলার ব্যবসায়ীরা যে চরম দূর্দশার মধ্যে পড়েন এবং জীবন নির্বাহ করতে তাদেরকে চুরি বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হতে হয় সেই ঘটনার অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায় এই খেলাটিতে। এই খেলার একটি ঘরের নাম 'নুনঘর'। নুনঘর থেকে 'নুন' বা 'লবণ' নেওয়ার ঘটনা থেকে যা সহজেই অনুমান করা যায়।

ড. অসীম দাস 'গাছছুয়া-গাছছুয়া' খেলাটিকে দুই লক্ষ বছরেরও বেশী আগেকার বৃক্ষবাসী মানুষের হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের ছবি বলে উল্লেখ করেছেন।[২৪] 'কানামাছি' খেলাটির মধ্যে মানুষের আদিম কতকগুলি সংস্কার বিচিত্র ভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। অন্ধ যদি কাউকে স্পর্শ করে ফেলে তাহলে সেও অন্ধ হবে এমনই একটি স্পর্শ মূলক জাদু সংস্কার প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মনে দানা বেঁধেছিল। সেই ভীতির বশেই, অন্ধকে না ছোঁয়ার একটি প্রয়াস তাঁদের মনে ক্রিয়াশীল ছিল, তারই অনুকরণে তাঁদের শিশুরাও তখন এই খেলার আদিমতম রূপটিকে তৈরী করেছিল। অরণ্যে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছির তাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতা এর পেছনে মিলে মিশে আছে। সংস্কার ও জীবিকান্বেষণ, এই দুই উপলক্ষ একত্রে এই খেলার মূল পরিকাঠামোটিকে গড়ে তুলেছে।[৩০] কানামাছির মতই আদিম আরণ্যক জীবনের স্মৃতিকণা জড়ো হয়ে আছে 'কুমির কুমির' খেলার মধ্যেও। "কুমির তোমার জলকে নেমেছি" — এ তো শত্রু শ্বাপদ সঙ্কুল

নদী অরণ্যের প্রতিবেশী মানুষের জীবন যাপনেরই প্রতিভাসবাহী। 'চোর চোর' খেলার মধ্যে স্পর্শ জাদুর সংস্কার টুকু এখানে অলক্ষে ক্রিয়াশীল রয়েছে। 'বউ বাসন্তি' এবং 'জোড় বাঁধাবাঁধি' এই খেলা দুটির মধ্যে বিবাহ প্রথা এবং নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক কি ভাবে বিবর্তিত হয়েছে - তার পরিচয় পাওয়া যায়। জমির অধিকার ইত্যাদি নিয়ে দ্বন্দ্বের অনুসূত্র দেখা যায় 'হা-ডু-ডু', 'গাদি', এক্কা দোক্কা' প্রভৃতি খেলার মধ্যে। 'লুকোচুরি' খেলায় আদিম মানুষের শিকার করার চর্চাটির প্রতিকী রূপ অস্পষ্ট নয়। ড. অসীম দাস 'ইকির মিকির', 'উপেনটি বাইস্কোপ' ও 'এলাটিং বেলাটিং' এই ছড়া যুক্ত ক্রীড়াগুলির সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'ইকির মিকির' খেলাটিকে একটি বিশ্বাস ঘাতকতার দলিল বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে কামিনী ভোগের চালচিত্র বলে 'উপেনটি বাইস্কোপ' ও 'এলাটিং বেলাটিং' খেলা দুটিকে উল্লেখ করেছেন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে পর্তুগীজদের আগমন শুরু হয়। পর্তুগীজ দস্যুরা বাংলার গ্রামবাসীদের যথাসর্বস্ব লুঠ করত, মেয়েদের ধর্ষণ করত, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিত। স্ত্রী-পুরুষ-ছেলে-মেয়ে সকলকে বন্দী করে দাস-দাসীর হাটে বিক্রী করত। এই খেলায় সেই চিত্রই ফুটে ওঠে। 'এলাটিং বেলাটিং' খেলাটিতে সমাজের একটি সকরুণ ঘটনা দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশের সমগ্র মধ্যযুগটি সাধারণ মানুষের নিকটে ছিল চোখের জলের যুগ। এই যুগে দাস প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। রাজাদের মেয়ে ভেট দেওয়ার প্রথাই এই খেলায় প্রতীয়মান। সুব্রত মুখোপাধ্যায় 'ছেলকা' খেলাটিকে বর্শা-নিক্ষেপের বিবর্তিত সংস্করণ বলে উল্লেখ করেছেন। কৃষির উদ্ভাবনের আগের ধাপে শিকারজীবি মানুষ পাথরে ফলা বসানো বর্শা নিক্ষেপ করে পশু পাখি শিকার দ্বারা ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবারণ করত। 'দাড়িয়া বান্ধা' খেলাটিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন শতকে প্রকৃতি, পরিবেশ, হিংস্র জন্তু, জানোয়ারের আক্রমণ প্রতিহত করে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছানোর অন্তিম প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন। 'বাঘচাল' খেলাটির মধ্য দিয়ে বাঘের (হিংস্র বন্য পশু) হাত থেকে ছাগল (অসহায় বন্য মানুষ) রক্ষার কলা কৌশল প্রদর্শিত হওয়ার কথা বলেছেন। 'মোঘল-পাঠান' খেলাটিতে সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ষোড়শ শতকে মোগল-পাঠানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের চিত্র ফুটে ওঠে।[৩১] 'শী বুড়ি' বা 'সীতাহরণ' খেলাটিতে রাবণদের হাত থেকে সীতা বুড়িকে রক্ষা করার চিত্র ফুটে ওঠে। 'রুমাল চুরি' খেলায় গ্রাম্য সমাজের ছবি ফুটে ওঠে। চুরি করা অন্যায় এবং এর জন্য শাস্তি পেতে হয় এ খেলার ভেতর দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।[৩২]

এরকম অনেক লোকক্রীড়ার মধ্যে প্রাচীন মানুষদের জীবন ধারণ প্রণালীর প্রতিভাস লক্ষ্য করা যায়। আবার অনেক লোকক্রীড়া এখনো বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যাদের ইতিহাস আজও আমাদের কাছে অজানা। সেই সমস্ত লোকক্রীড়া গুলির ইতিবৃত্ত সন্ধান করতে পারলে প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনকেই চেনা যাবে। ইতিহাসের অনেক সংশয়কে দূর করা সম্ভব হবে লোকক্রীড়া গুলির বিশ্লেষণ থেকে।

লোকক্রীড়ার গুরুত্ব ঃ

লোকসংস্কৃতি লোকায়ত সমাজের জীবন প্রক্রিয়ার (Life Practice) ফসল। অর্থাৎ মানুষের জীবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভুত হয়েছে লোকায়ত জীবন কেন্দ্রিক বিভিন্ন উপাদান।

আর এই সব উপাদানের একটি অন্যতম উপাদান হল 'লোকক্রীড়া'। বলা বাহুল্য লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি সৃষ্টির পিছনে যথেষ্ট কারণ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। এই সূত্রে লোকক্রীড়াগুলির উদ্ভবের পিছনেও সেই তাৎপর্য বিদ্যমান। নৃবিজ্ঞানী কার্ল গ্রুস, মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এবং সংস্কৃতি বিজ্ঞানী আর্চার টেলরসহ বিভিন্ন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা এই সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। এই লোকক্রীড়াগুলি উদ্ভবের নেপথ্যে যেমন নানা কারণ রয়েছে, তেমনি খেলাগুলি একটি নির্দিষ্ট সমাজে প্রচলনের এক ধরনের ধারাবাহিকতা বর্তমান।

মানুষ তার প্রয়োজন বা তাগিদ অনুসারে প্রয়োজনীয় উপাদান, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি সৃষ্টি করে। লোকক্রীড়াগুলি এই প্রয়োজন অনুষঙ্গের বাইরে নয়। অর্থাৎ এই ধরনের খেলাগুলির মাধ্যমে খেলেয়াড়দের তাগিদ প্রমাণিত হয়েছে। খেলাগুলি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের সদস্যেরা উপকৃত হয়েছে শারীরিক ও মানসিকভাবে। সহজভাবে বলা যায় লোকক্রীড়াগুলি শারীরিক ও মানসিক কাঠামো গঠনে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে চলেছে। মূল কথা হল, প্রতিটি সমাজে প্রচলিত খেলাগুলির সেই সেই সমাজের প্রসঙ্গে (context) বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আর সমাজে খেলাগুলির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য রয়েছে বলেই আজও আমাদের সমাজে লোকক্রীড়ার ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সমুজ্জ্বল ভাবে বজায় আছে।

তাছাড়াও লোকক্রীড়াগুলি সমাজগঠনে কার্যকরী ভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। আর এই সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্বকে স্বীকার করে ঠিক একই ভাবে বিশ্বব্যাপী সচেতন ভাবে সৃষ্টি হয়েছে নানা শিষ্টক্রীড়া। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিষ্টক্রীড়াগুলি সৃষ্টির পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে লোকক্রীড়ার ভূমিকা রয়েছে। স্বভাবতঃই লোকায়ত বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে লোকক্রীড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। লোকক্রীড়ার কার্যকরী ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণভাবে কয়েকটি গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য —

ক) সামাজিকতা বা সামাজিকীকরণ বা Socialization.
খ) সামাজিক প্রতিবাদ বা Social Protest.
গ) সামাজিক শিক্ষা বা Social Education.
ঘ) বিনোদন বা Recreation.
ঙ) সংযোগ মাধ্যম বা communicative Media.
চ) শরীর চর্চাগত দিক বা Physical Activity Aspect.

(ক) সামাজিকীকরণ ও লোকক্রীড়া ঃ

মানব শিশু জন্ম নেয় জৈবিক প্রাণী হিসাবে, সামাজিক জীব হিসাবে নয়। প্রাথমিক অবস্থায় সে থাকে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, অসহায়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তাকে নির্ভর করতে হয় অন্যের ওপর। অপরের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তার থাকে না। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রয়োজনের তাগিদে অন্যদের সঙ্গে মানিয়ে নেবার আচরণ বিধি তাকে শিখতে হয়। এই ভাবে একটি জৈবিক প্রাণী থেকে তার উত্তোরণ ঘটে সামাজিক জীবে। এই উত্তরণের পদ্ধতিকেই বলা হয় সামাজিকীকরণ। শিশুকে সামাজিকীকরণের দায়িত্ব পরিবার, সমাজ

এবং জাতির। সামাজিক কাঠামো অনুসারে সমাজের সদস্যেরা সময় সাপেক্ষে নিজেদেরকে অভিযোজিত করে। অর্থাৎ শৈশব থেকে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে সমাজের সদস্যেরা নিজেদেরকে পরিণত করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে। সামাজিক গুণাবলী অর্জন, সামাজিক রীতির্নীতির সঙ্গে পরিচয়, সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া ইত্যাদি। লোকক্রীড়া এই সামাজিকীকরণকে ত্বরান্বিত করে, সাহায্য করে। লোকক্রীড়ার মাধ্যমে শিশুরা শিখতে পারে সামাজিকতাবোধ, সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিবোধ, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। লোকক্রীড়াগুলি ব্যক্তির মধ্যে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্যবোধ ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে অনায়াসে। শুধু তাই নয় খেলাগুলির মাধ্যমে সামাজিক প্রক্রিয়াগুলিকে অনুধাবন করে। যেমন পুতুল খেলার মাধ্যমে পারিবারিক নানা চরিত্রের অনুকরণ করে পরিবারের খুঁটিনাটি বিষয়কে ছোট থেকেই উপলব্ধি করতে থাকে। অনুরূপভাবে 'রান্নাবান্না' 'বর কনের জুয়া খেলা' 'আগডুম-বাগডুম' 'রুমাল চুরি' লোকক্রীড়াগুলিতেও এ দৃশ্য চোখে পড়ে। সুতরাং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে লোকক্রীড়ার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

(খ) সামাজিক প্রতিবাদ ও লোকক্রীড়া ঃ

সমাজে প্রচলিত শোষন, বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা মানুষ ব্যক্ত করে লোকক্রীড়ার মাধ্যমে। লোকক্রীড়াগুলির মধ্যে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ভাবে সামাজিক প্রতিবাদ খুব স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। বলাবাহুল্য সমস্ত লোকক্রীড়াই প্রতিবাদ কেন্দ্রিক নয়। তবে বেশ কিছু খেলার মধ্যে সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। দুর্বলেরা সবলের অত্যাচারের প্রতিবাদ যখন সরাসরি ভাবে করতে পারেনি তখন এই ধরনের মাধ্যম গুলির আশ্রয় নিয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত লোকক্রীড়াগুলি বহন করে চলেছে সাবলীলভাবে। যেমন মধ্যযুগীয় প্রবঞ্চনা ও শোষনের একটি সরলতর চিত্র ফুটে ওঠে 'রাজার কোটাল' নামক লোকক্রীড়ায়। চৌকিদাব, তহশীলদার পদে যারা বৃত থাকত তারা নিরক্ষর ও সরল গ্রামবাসীদের নানা প্রকারের ভীতি প্রদর্শন করে নানা প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করত। 'রাজার কোটাল' নামক লোকক্রীড়ায় যে চিত্রটি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায় এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষীরা একজোট হয়েছে এবং প্রথমবার কলা নিয়ে যাবার পর দ্বিতীয়বার এলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাকে কিল, চড়, ঘুসি মারতেও দেখা যায়। যা বাস্তবে সম্ভব নয়। লোকক্রীড়ার মধ্য দিয়ে যে প্রতিবাদ সহজেই করা সম্ভব হয়েছে। অনুরূপভাবে 'লুন্ডই' খেলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সামন্তযুগের 'জোর যার মুলুক তার' নীতি। 'জেলে মাছ' খেলাতেও বাংলাদেশে মধ্যযুগে চালু কুখ্যাত দাস কেনাবেচা ও কামিনীভোগের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। 'উপেনটি বাইস্কোপ', 'এলাটিং বেলাটিং', 'এক্কাদোক্কা', 'লাললাঠি' প্রভৃতি খেলার মধ্যেও এই ধরনের প্রতিবাদের চিত্র ফুটে ওঠে।

(গ) সামাজিক শিক্ষা ও লোকক্রীড়া ঃ

লোকক্রীড়া জনশিক্ষা প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সার্বিকভাবে শিক্ষা

গ্রহণের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল লোকক্রীড়া। অর্থাৎ লোকক্রীড়া বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে। এই ক্রীড়াগুলির মধ্য দিয়ে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু ও জাতপাতের সামাজিক ভেদাভেদ দূর করা যায় সহজেই। শিশুকে সামাজিক ও হাসিখুশী স্বভাবের করে গড়ে তোলে। সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত করে। সহযোগিতার মনোভাব ও দলের সদস্য হিসাবে দায়িত্বপালনে উদ্বুদ্ধ করে। 'ডাব্বা ডাব্বা' খেলায় 'শুক্লার বর এসেছে লাল মিষ্টি এনেছে' ছড়াটি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আত্মীয়ের বাড়ীতে মিষ্টি আনার প্রচলিত রীতি। 'রান্নাবান্না' 'ভাত ভাত' প্রভৃতি লোকক্রীড়ায় সাংসারিক জীবনের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডের অনুকরন লক্ষ্য করা যায়। যে শিক্ষা প্রতিটি বালিকারই ভবিষ্যতের মহড়া বলা যায়। 'মার্বেল' খেলায় খাটনদারের গুটিকে আঘাত করার সময় বিজয়ীরা যে কথাগুলি উচ্চারণ করে সেগুলি হল — 'একে ইন্দুর/দুইয়ে দাঁত' 'তিনে তেলি/চারে চোর' এভাবে সাতাশ পর্যন্ত চলে। স্বভাবতঃই শিশুরা '১' সংখ্যা থেকে '২৭' পর্যন্ত এই ক্রীড়ার মধ্য দিয়ে গণনা (counting) শিক্ষা লাভ করে। কোথাও কোথাও 'একে চন্দ্র/দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র/চারে বেদ, ছয়ে ঋতু/সাতে সমুদ্র' ইত্যাদি শব্দও ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই ক্রীড়ার মধ্য দিয়ে চাঁদ, বেদ, সমুদ্র, ঋতু ইত্যাদির সংখ্যা শিশুরা অনায়াসে জানতে পারে। তাছাড়া 'চোর পুলিশ' খেলায়ও অনুরূপভাবে এই গণিত শিক্ষা অবশ্যই সহজতর হয়। 'আগডুম-বাগডুম' 'রসকস' 'ইকিড় মিকিড়' 'ব্যাঙের মাথা' প্রভৃতি ছড়ার খেলাগুলি ছন্দ মিল ও সুরবোধ তৈরীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। স্বভাবতঃই লোকক্রীড়ার সামাজিক মূল্য অপরিসীম।

(ঘ) বিনোদন ও লোকক্রীড়া ঃ

লোকক্রীড়ার উপাদান বিনোদন, মজা ও আনন্দের। মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য বিনোদন আবশ্যিক শর্ত। একঘেয়েমিতাকে কাটানো বা নতুন উদ্যোগে নিজের কাজে নিযুক্তির জন্য প্রয়োজন হয় মানসিক বিশ্রাম। বিভিন্ন মনোবিদ একথা স্বীকার করেছেন যে, কাজের প্রকৃতির পরিবর্তন মানসিক অবসাদ কমায়। লোকক্রীড়া এই বিনোদন প্রক্রিয়ায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। 'গোল্লাছুট', 'ডাংগুলি', 'গাদি', 'বউবাসন্তী', 'কুমির কুমির' প্রভৃতি লোকক্রীড়াগুলি বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম, যেগুলি শিশুদের আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে রাখতে পারে অনায়াসে। স্বভাবতঃই লোকক্রীড়া অবসাদ, ক্লান্তি, একঘেয়েমি দূর করে উপযোগী মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে।

(ঙ) সংযোগ মাধ্যম ও লোকক্রীড়া ঃ

লোকক্রীড়াগুলি লোকায়ত সমাজের মধ্যে সংযোগ সাধনের সেতু হিসাবে কাজ করে। এই সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে খেলার ছলে দেশীয়ভাবে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলতে পারি দেশীয় সংযোগ প্রক্রিয়া বা Indigenous Communication System, লোকক্রীড়া ঐতিহ্যের ধারা প্রবাহে এই ঘটনা আবহমান কাল ধরে ঘটে চলেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য লোকক্রীড়া জৈবিক গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের যাবতীয় বিষয়ের আলেখ্য। সর্বোপরি, তথাকথিত উচ্চ সমাজ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি গড়ে ওঠা লোকায়ত

সমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রথা-আচার-বিশ্বাস-সংস্কার, বিনোদন, ধর্মভাবনা ও শরীর গঠনের এক বিশ্বস্ত দর্পণ। তাছাড়া সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ক্রমবিবর্তনের রূপটি এই ধরনের খেলাগুলির মধ্যে কোথাও স্পষ্ট, আবার কোথাও ক্ষীণভাবে সংযুক্ত থাকে। অন্যদিকে এই বিষয়গুলি তথ্য হয়ে ওঠে, যা অন্যান্য সংযোগ মাধ্যমের মত লোকক্রীড়াও বহন করে এবং পরিবেশন করে। বিভিন্ন ঘটনা লোকক্রীড়ার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয় প্রদর্শনের মাধ্যমে। এই সূত্রে আমরা বলতে পারি লোকক্রীড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে লোকসাংবাদিকতার কাজ করে। 'রাজার মেয়ে ডিস্কো নাচ', 'চাঁদমারী চৈ চৈ', 'চোর পুলিশ', 'গুটিখেলা', 'মোহনবাগান বল্লভপুর', 'শীবুড়ি' প্রভৃতি লোকক্রীড়াগুলি সহজভাবে এই সংযোগ মাধ্যমের কাজ করে থাকে। সর্বোপরি এই প্রক্রিয়া জানান দিয়ে চলেছে সমাজ কাঠামো টিঁকিয়ে রাখার নানা সঞ্জীবনী। যার জন্য বলা যায় — 'This genre was a great potentiality as a communication mode of culture.'[৩৩]

(চ) শরীর চর্চা ও লোকক্রীড়া ঃ

লোকক্রীড়ার মাধ্যমে শারীরিক গঠনের উন্নতি, শারীরবৃত্তিয় যন্ত্র ও তন্ত্রসমূহের কর্মদক্ষতার উন্নতি, শারীরিক স্বাস্থ্য ও ক্ষমতার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। নিয়মিত লোকক্রীড়াগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া, সক্ষমতার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করা, ক্লান্তি দেরীতে আসা, পরিশ্রমের পর দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দেহের রক্ত সংবহনতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র সহ অন্যান্য তন্ত্রসমূহের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। একথা সর্বজন বিদিত যে, দেহযন্ত্র ব্যবহার নীতি মেনে চলে। অর্থাৎ ব্যবহারে দেহযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু ব্যবহার না করলে এই যন্ত্রের কার্যক্ষমতা কমে যায়। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসামান্য অগ্রগতি মানুষের দৈহিক কাজকর্ম করার প্রয়োজনীয়তা কমিয়েছে। ফলে দেহযন্ত্র অব্যবহারের কারণে পরিশ্রম বিমুখজনিত (Hypokinetic) রোগের প্রকোপ বাড়ছে। শিশুদের স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। লোকক্রীড়া অনায়াসে বর্তমান এই চরম সঙ্কট থেকে মানুষকে বিপন্মুক্ত করতে পারে। 'গাদি', 'ডাংগুলি', 'বউবাসন্তি', 'এক্কাদোক্কা', 'খুদিমুদি', 'হউড়ি' এই খেলাগুলি হতে পারে এই সঙ্কট মোকাবিলার অন্যতম হাতিয়ার।

তথ্যসূত্র

১। Shephard, R. J. — **Physical Activity and Growth,** Year Book Medical Publishers, Inc. Chikago, London, 1982.

২। Ross, James S. — **Ground Work of Educational Psychology,** London, 1953.

৩। Stern, W. — Cited by Sharma, R. N., **Educational Psychology,** Rastogi Publication, Meerut, 1967.

৪। রায়, সুশীল — **শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন,** সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৯৮।

৫। Kamlesh, M. L. — **Psychology of Physical Education and Sports,** Metropoliton Book Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 1983.

৬। Hurlock, E. B. — **Child Development,** McGrow-Hill, Tokyo, 1956, cited by Mongal S. K. **Educational Psychology,** Prakash Brothers, Ludhiana, 1985.

৭। Ryburn, W. M. — **Introduction to Educational Psychology,** Oxford University Press, 1956.

৮। ভট্টাচার্য, অরুণ কুমার — **খেলার ক্রমবিকাশ,** প্রকাশিত হয়েছে Souvenir Cum Selected Writings of Prof. A. K. Bhattacharyya, Department of Physical Education, Kalyani University, 1993.

৯। Williams, J. F. — **The Principles of Physical Education** Philadelphia, Saunders, 1964.

১০। Adams, William C. — **Foundation of Physical Education, Exercise and Sport Sciences,** Lea & Febiger, Philadelphia, London, 1991.

১১। ব্যানার্জী, অলোক কুমার — **ওলিম্পিক আন্দোলন,** Olympic Centenary Commemoration, Athletic Coaches Association of West Bengal, Calcutta, 1996.

১২। Barrow, Harold M. — **Principles of Physical Education,** Lea & Febiger, Philadelphia, 1983.

১৩। Schiller, F. Von. — Cited by Kamlesh, M. L., **Psychology of Physical Education and Sports,** Metropoliton Book Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 1983.

১৪। Groose, K. — **The Play of Animals,** New York, D. Appleton and **The Play of Man,** New York, D. Appleton.

১৫। সেন, রথীন্দ্র কুমার : **শারীর শিক্ষার ইতিহাস**, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০।

১৬। Das, Shankar Nath : **Physical Education, Games and Recreation in Early India,** The upper India Publishing House Pvt. Ltd., Aminabad, Lucknow, 1985.

১৭। Khemraj, S. D. : **Harivanisa Purana,** Sri Venkateshwara Steam Press, Bombay, 1926-30.

১৮। Tawncy, C. H. : **Somadevas Kathasarit Sagar,** Varanasi Motilal Banarasidas, 1968.

১৯। Beal, S. : **The Romantic Legend of Sakya-Buddha,** Trubner & Co., London, 1875.

২০। Vaidya, P.L. : **Lalita Vistara, Buddhist Sanskriti Text, No.1,** Darbhanga, Mithila Institute, 1958, Chapt - III.

২১। Konar, Janmenjoy : **Physical Education Scenario of West Bengal 1882-1982,** Ph. D. Thesis, Department of Physical Education, University of Kalyani, 2002.

২২। Brishagratna, K. K. : **The Susrata Samhita, Vol.- III,** Varanasi Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1963, Chap-XXV. 25.

২৩। 'Encyclopaedia Britanica' : **Vol.VIII & Vol. XI,** Cambridge, 1910.

২৪। দাস, অসীম : **বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস,** পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯১।

২৫। ব্যানার্জী, অলোক কুমার : **বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ,** অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ১৯৯৫।

২৬। চক্রবর্তী, বরুণ কুমার : **বাংলার লোকক্রীড়া,** পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০০১।

২৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : **রচনাবলী (সাহিত্যের পথে),** ত্রয়োবিংশ খণ্ড, বাং সন ১৩৫৪, কলকাতা।

২৮। ভারতচন্দ্র, রায়গুণাকর : **ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী** (সম্পাদনায়), বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বাং সন ১৩৯০।

২৯। চৌধুরী, নারায়ণ : **ধর্ম ঃ মৌলিক বনাম আনুষ্ঠানিক,** যুক্তিবাদীর চোখে ধর্ম, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৯২।

৩০। সেনগুপ্ত, পল্লব : **লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ**, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫।

৩১। মুখোপাধ্যায়, সুব্রত : **সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া**, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১।

৩২। ইসলাম, মাযহারুল তরু : **চাঁপাই নবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতি পরিচিতি**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯।

৩৩। Mukhopadhyay, D. : **Folk Art and Social Communication**, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1994.

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকক্রীড়ায় পূর্ববর্তী গবেষণা

লোকক্রীড়ার সংজ্ঞা অনুধাবন করে একথা বলা যেতে পারে যে, ক্রীড়া বা লোকক্রীড়া বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের জীবনসংস্কৃতির একটি অঙ্গ; যা যুগে যুগে মানুষ অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। বিশিষ্ট ক্রীড়া বিজ্ঞানীরা ও গবেষকেরা তাঁদের লেখায় একথা তুলে ধরেছেন। তাঁরা আরও উল্লেখ করেছেন যে, এই ধরণের খেলাধূলার ইতিহাস বস্তুতঃপক্ষে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। লোকক্রীড়ার গবেষণা এবং এই সংক্রান্ত তথ্য ও প্রকাশনা খুবই আধুনিক। যদিও লোকক্রীড়া সুপ্রাচীন। খেলাধূলার যে ইতিহাস বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাকে সরাসরি হয়তো লোকক্রীড়ার ইতিহাস বলা যাবে না। কিন্তু এই ইতিহাস পর্যালোচনা থেকেই আমরা লোকক্রীড়া সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত ও উপাদান উপলব্ধি করতে পারি। অত্যন্ত প্রচীন কালের ঐতিহাসিক উপাদান পর্যালোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন সুমেরীয় সভ্যতায় (৩০০০-১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, বাধা অতিক্রম যুক্ত দৌড়, নৃত্য, দড়ি টানাটানি, লাফানো, সাঁতার প্রভৃতি খেলার প্রচলন ছিল। চৈনিক সভ্যতায় (১১০০-২৫৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) নানা ধরনের শারীরিক কসরৎ ও চর্চার ব্যবস্থা ছিল। ঐ সময়ে আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়া (Martial Art) ও শরীর চর্চার প্রচলন ছিল, যা আজ আরও উন্নত পর্যায়ে সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। সিন্ধু সভ্যতার (৩২৫০-২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান আমাদেরকে আরও সমৃদ্ধ করে। সাঁতার, মল্লযুদ্ধ, নৃত্য প্রভৃতি খেলাগুলি তৎকালীন সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল।[১]

প্রাচীনকালে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার অভূতপূর্ব উন্নতি লক্ষ্য করা যায় গ্রীক সভ্যতায়। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকেরা (প্রায় ৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) মানুষের সামগ্রিক বিকাশের জন্য মেধা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শরীর চর্চাকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, অঙ্কন প্রভৃতি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা ও শরীর চর্চাকে জীবনের প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। গ্রীকরা অলিম্পিকের স্রষ্টা। প্রাচীন অলিম্পিকে একাধারে যেমন দৌড়, লাফানো, ডিসকাস ছোঁড়া, বর্শা ছোঁড়া, মল্লযুদ্ধ, অসিচালনা প্রভৃতি প্রতিযোগিতা ছিল অন্যদিকে তেমনি শিল্প ও সাহিত্যকর্ম প্রতিযোগিতারও প্রচলন ছিল।[২] গ্রীক সভ্যতার পতনের পর পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে রোমান আধিপত্য। গ্রীক সভ্যতায় প্রচলিত বিভিন্ন শরীর চর্চার কিছু অবশিষ্টাংশ লক্ষ্য করা যায় এই যুগেও। এ যুগ শরীর চর্চা ও বিদ্যার বিস্তারে অন্ধাকারময় যুগ। খেলাধূলার ক্ষেত্রে ভিন্নতম রুচি, নিস্ক্রিয় থেকে আদিম নৃশংসতম উল্লাস-গ্ল্যাডিটোরিয়াল কম্ব্যাট, মানুষ ও পশুর আমৃত্যু লড়াই, যা রোমানদের আবিষ্কার এই সময়ে প্রচলিত ছিল। এই সময়ে এশিয়া

মাইনরে রোম সম্রাটরা অ্যাম্ফিথিয়েটার (যা বর্তমান সময়ের স্টেডিয়ামের সমতুল) তৈরী করেছিলেন। অনেক ব্যাক্তির একত্রে এক জায়গায় বসে খেলা দেখার বা পাশবিক উল্লাস উপভোগ করার জন্য তৈরী হয়েছিল এই অ্যাম্পিথিয়েটার। ক্রীতদাসদের বাধ্য করা হত আর এক ক্রীতদাস বা হিংস্র পশুর সঙ্গে আমৃত্যু লড়াই করতে যা গ্ল্যাডিটোরিয়াল যুদ্ধ বলে পরিচিত। শুরু হয় খেলায় অংশ গ্রহণ নয়, বসে আনন্দ উপভোগ করার যুগ।[৩]

মধ্যযুগ (৪০০-১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) শিক্ষা সংস্কৃতির অবরুদ্ধ কাল। শরীর চর্চাও তার ব্যতিক্রম নয়। রেনেসাঁ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনে চার্চের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয় এবং শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রীক সভ্যতার উজ্জ্বল দিকগুলি নতুন করে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করার উদ্যোগ শুরু হয়। খেলাধূলা ও শরীর চর্চার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।[৪]

যোড়শ শতাব্দী থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্য বিস্তার ও শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের বাজার তৈরীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে লেগে থাকত যুদ্ধ। পরাধীন জাতিগুলি নিজেদের জাতিসত্তার লাঞ্ছনা ও অপমান দূর করার উদ্দেশ্যে জাতিয়তাবাদী আন্দোলনে ও শক্তিশালী জাতি গঠনে প্রয়াসী হয়। ফলতঃ শুরু হয় নতুন করে শরীর চর্চা ও খেলাধূলার প্রসার। এই আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কয়েকজন শিক্ষাবিদ একটি নতুন ধারার প্রয়োগ করেন, যা শরীর চর্চা ও খেলাধূলার ইতিহাসে মূল্যবান অবদান বলে পরিগণিত। বেসডাও, গুটসমূথ্স, লুডউইক জান জার্মানীতে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। ফ্রানচ ন্যাটগল ডেনমার্কে এবং হেনরিক লিং সুইডেনে খেলাধূলা ও শরীরচর্চার নব নব ধারা চালু করেন। ডেনমার্ক প্রথম শরীর চর্চাকে শিক্ষাক্রমে আবশ্যিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে।[৫]

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকালের পূর্বে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার যে সামগ্রিক চিত্র ঐতিহাসিকেরা অনুধাবন করেছেন তা থেকে জানা যায় — তৎকালে খেলাধূলা ও শরীরচর্চা মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এগুলি সাধারন মানুষের বিশেষ করে গ্রামীণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা ও শরীর চর্চারও প্রসার ঘটে। প্রসার ঘটে শিষ্ট ক্রীড়ার যা শহরাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামীণ মানুষ অবসর বিনোদন ও আনন্দ লাভের জন্য বেছে নেয় লোকক্রীড়া, যা আজও গ্রামীণ মানুষের বেঁচে থাকার রসদ। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, খেলার ইতিহাসের মধ্যেই লোকক্রীড়ার ইতিহাস অন্তর্নিহিত ভাবে রয়েছে।[৬]

লোকক্রীড়া নিয়ে গবেষণা তুলনামূলকভাবে খুবই নবীন। এই সংক্রান্ত গবেষণা পত্র বা প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের লেখা যা পত্র-পত্রিকা বা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা খুবই সীমিত। শরীর-চর্চার সংস্কৃতির আঙ্গিকে লোকক্রীড়ার মূল্যায়ন বা আলোচনা নজরে তেমন পড়েনি। লোকক্রীড়া নিয়ে সাধারণ আলোচনা বা তার সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু গবেষণা পত্র এবং কিছু লেখা (Article) প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে যতদূর সম্ভব লোকক্রীড়া সংক্রান্ত প্রকাশনাগুলি খুঁজে তা থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

লোকসংস্কৃতি নিয়ে যে কোন আলোচনা শুরু করলে খুব সাধারণ ভাবে যে ব্যক্তির নাম চলে আসে তিনি হলেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। 'বাংলার লোকসাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া' (১৯৬৩)[৭] বইতে আশুতোষ ভট্টাচার্য খেলার ছড়া নিয়ে লিখেছেন। খেলার ছড়া নিয়ে আলোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে বার বার স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ থেকে 'আগডুম-বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটি অঞ্চল বিশেষে অপভ্রংশ বা বিকৃত হয়ে যে বিভিন্ন রূপে মানুষের মুখে মুখে ছড়াটি ফিরেছে তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং ছড়াটির সামাজিক প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। উক্ত ছড়াটি সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে যে রূপ পেয়েছে তার সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের প্রচলিত শব্দগুলির সাযুজ্য খুঁজে দেখিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে 'আইকম-বাইকম তাড়াতাড়ি, যদু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী' ছড়াটিকেও বাংলাদেশে ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে প্রচলিত ধারার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রচলিত 'উপেনটি বাইস্কোপ-নাইন টেন টেইস্কোপ' ছড়াটি 'আইকম-বাইকম' ছড়ার অপভ্রংশ হয়ে এসেছে ও 'ইকির-মিকির' খেলার প্রচলিত ছড়াটির সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

'হাডুডু' খেলাটিকে আদিম সমাজের গোষ্ঠী সংগ্রামের অবশেষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই খেলায় আত্মরক্ষা ও আক্রমণের যে সমস্ত পদ্ধতি দেখা যায় তা যুদ্ধনীতি সম্মত। এই খেলাটিই গ্রাম বাংলার কিশোর ও যুবকদের একমাত্র খেলা, যার মধ্যে পুরুষের পৌরুষের পরিচয় লভ্য। এই খেলার সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কি কি ছড়া প্রচলিত আছে সে বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। 'চোর চোর' বা অন্যান্য অনেক খেলায় প্রথম চোর নির্বাচন করার জন্য যে সমস্ত প্রচলিত ছড়া আছে তাদের উৎস, বিবর্তন ও পরিবর্তন বিষয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর 'লোকসাহিত্য' (প্রথম খণ্ড, ১৯৬৭)[৮] পুস্তকে লোকক্রীড়া নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, গ্রামীণ প্রচলিত খেলাগুলির সঙ্গে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত খেলাগুলির সামঞ্জস্য আছে। এর অর্থ এই খেলাগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। 'গোল্লাছুট' খেলাটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — 'গোল্লা ও অন্যান্যদের হাত ধরে বেশ একটা লম্বা লাইন হত। তারা কিছুক্ষণ হাত ধরে ঘুরতো চক্রাকারে গোল্লার চারপাশ দিয়ে - যেন এক সূত্রে বাঁধা একটি সমাজ। তারপর সীমানা অতিক্রমের জন্য খসে পড়তো। অর্থাৎ চারদিকে শত্রু, কিন্তু দৌড়ের জোরে শত্রুসীমা অতিক্রম করে নিরাপদ স্থলে পৌঁছতে হবে।' 'ছাউসি' খেলা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রচলিত ছড়াটির সঙ্গে খেলার সম্পর্ক দেখিয়েছেন এবং এই খেলাটির মধ্যে শত্রুপক্ষকে ব্যস্ত রেখে চালাকির সঙ্গে ছানা অথবা শিশুকে কি ভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছেন।

আশরাফ সিদ্দিকী কিছু কিছু খেলার উৎস সম্পর্কে তাঁর মতামত এই পুস্তকে রেখেছেন। 'দাঁড়িয়া বাধা' বা 'হাডুডু' খেলাকে তিনি জোটবদ্ধ এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে উল্লেখ করেছেন। এই খেলাগুলির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন যে, এই খেলাগুলির কোনটিতেই অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার সীমাবদ্ধতার দরকার হত না। যতজনের ইচ্ছা ততজন এই খেলায় অংশগ্রহণ করত। অর্থাৎ

খেলাটির আনন্দই প্রধান, অনমনীয় আইন দ্বারা শাসিত নয়। বেশকিছু প্রচলিত খেলার Motif নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন তাঁর এই পুস্তকে। 'বাঘবন্দী' খেলাটিকে তিনি আদিম আদিবাসীদের জীবন যাত্রার অনুকৃতি থেকে উদ্ভূত খেলা বলে অভিহিত করেছেন যা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও সাবলীল ভাবে প্রচলিত হয়েছে।

বিখ্যাত গবেষক Murray-র মতামত উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন বর্তমানে বহুল প্রচলিত দাবা খেলাটি আসলে একটি ভারতীয় লোকক্রীড়া। খেলাটি ইউরোপ এবং সারা পৃথিবীতে 'Chess' নামে পরবর্তীতে প্রচলিত হয়েছে। যুদ্ধের চারটি অঙ্গ হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতিক খেলাটির মূল Motif, যা ভারতীয় যুদ্ধ ব্যবস্থার প্রচলিত অনুষঙ্গ।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর এই গ্রন্থে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে যে সমস্ত খেলাগুলি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে সেগুলি সম্পর্কে মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন। বিখ্যাত লোকবিজ্ঞানী সি.এফ.পটার এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন আমাদের প্রচলিত লোকক্রীড়া গুলিতে যে সমস্ত ছড়া ব্যবহৃত হয় অনুরূপ ছড়া ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর সর্বত্রই বিদ্যমান। ভাষা বিভিন্ন হলেও ছড়াগুলির মধ্যে আশ্চর্যজনক সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক খেলার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যেগুলি পল্লী বাংলার চিরন্তনি কৃষক জীবনের মিলন বিরহের রস মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলিত লোকক্রীড়াগুলির সন্ধান করেছেন এবং যতখানি সম্ভব সেই খেলাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি রেখেছেন।

ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' (১৯৭৪)[১] গ্রন্থে লৌকিক খেলাগুলির উৎস ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন খেলা মানুষের জীবনে দুভাবে উপকার করে আসছে। এক : দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিকতার মাঝে আবিষ্ট মনের মুক্তি — এ মুক্তি সাময়িক হলেও জীবন যাত্রার পথে নবশক্তির সঞ্চার করে। দুই : শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্য রক্ষা; কায়িক শ্রমসাপেক্ষ খেলাধূলায় শরীরের সুস্থতা ও সবলতা বৃদ্ধি পায়, মানুষ দীর্ঘায়ুর অধিকারী হয়। জীবন যাপনের উভয়বিধ উপযোগিতা থেকে মানুষ খেলাধূলার চর্চা করে আসছে। তিনি লিখেছেন পশু ও মৎস্য শিকার করে মানুষ এক সময় আহার্য উপকরণ সংগ্রহ করত। এখন শিকার শখে (Hobby) পরিণত হয়েছে। কুস্তি, লাঠিখেলা এক সময় আত্মরক্ষার অত্যাবশ্যক উপায় ছিল। পরবর্তী কালে তা খেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন শুধু চিত্তবিনোদন বা শরীর চর্চা থেকেই খেলার সৃষ্টি হয়নি, লোকবিশ্বাস, ধর্মীয় প্রেরণা, মন্ত্রশক্তি, যাদুবিশ্বাস প্রভৃতিও খেলার উৎসমূলে লক্ষ্য করা যায়।

কতকগুলি খেলাকে তিনি জীবনের অনুকরণ বা অভিনয়ের অভিব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। 'রাজার কোটাল', 'চোরচোর', 'মোগল পাঠান' প্রভৃতি গ্রাম্য খেলার মধ্যে জীবনের ছবি আবিষ্কার করা যায়। ছড়ার খেলাগুলির মধ্যে নাটকের আদিরূপ প্রথম বিকাশ লাভ করেছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। খেলার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ফলাকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনের ও খেলার বৈশিষ্ট্য। দলবদ্ধ জীবনের অনুকৃতি বেশীর ভাগ খেলাতেই সুস্পষ্ট। নিঃসঙ্গ মানুষ নিঃস্ব রিক্ত। খেলার প্রাঙ্গণকে তাই মানুষ চেয়েছে মিলন তীর্থে রূপান্তরিত করতে। পাশ্চাত্য

বিশেষজ্ঞদের উল্লেখ করে তিনি খেলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন — (ক) Games of Skill, (খ) Games of Chance, (গ) Games of Imitations. এছাড়াও তিনি প্রচলিত খেলাগুলির শ্রেণী বিন্যাস করার চেষ্টা করেছেন। বাংলার গ্রাম্য খেলার বৈশিষ্ট্য, অনুশীলন পদ্ধতি, খেলার বিষয়গুণ এবং স্থান ধর্ম অনুধাবন করে তিনি খেলাগুলিকে ৫টি ভাগে বিভাজন করেছেন — (১) শ্রম সাপেক্ষ শরীর চর্চার খেলা, (২) শ্রমহীন আমোদের খেলা, (৩) পানির খেলা, (৪) ছড়া ও ধাঁধার খেলা ও (৫) আনুষ্ঠানিক খেলা।

খেলার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রচলিত বেশ কিছু খেলা, যেগুলিকে তিনি লৌকিক খেলাধূলা বলে অভিহিত করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, খেলার পদ্ধতি, ফল নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই খেলাগুলির মধ্যে কয়েকটি খেলা পাওয়া গেছে যা ততোধিক পরিচিত নয়, বা অন্য লেখকরাও সেভাবে আলোকপাত করেননি। যেমন - 'এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা', 'গাইগোদানি', 'সোলঝাপটা', 'হোলডুগ', 'পানিঝুপ্পা' প্রভৃতি।

বাংলা ভাষায় শারীর শিক্ষা বাদ দিয়ে খেলাধুলো বিষয় নিয়ে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার বেশীর ভাগই তথ্যমূলক বা বিনোদনমূলক। এই গ্রন্থগুলিতে মূলতঃ বিখ্যাত খেলোয়াড়দের জীবন ও খেলা সম্পর্কিত বিষয় নিয়েই আলোচিত হয়েছে। কিছু গ্রন্থে খেলার মাঠের বাইরের ছোট ছোট বিষয় নিয়েও আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে কিছু গ্রন্থে মূলতঃ খেলার আইন ও সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, খেলা শেখানোর পদ্ধতি নিয়েও কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অমল দত্তের (১৯৬৯)[১০] 'ফুটবল খেলতে হলে'। শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় বসু প্রভৃতি কয়েকজন লেখক ক্রিকেট নিয়ে সুখ পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন যা বেশ জনপ্রিয়ও বটে। অমল দত্তের 'ঘেরা মাঠ ছড়ানো গ্যালারী' (১৯৭২)[১১]খেলোয়াড়দের সুখ দুঃখ নিয়ে সুন্দর রম্য রচনা। খেলার মাঠ এবং খেলোয়াড়— প্রশিক্ষকদের নিয়ে মতি নন্দী অত্যন্ত জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় উপন্যাস রচনা করেছেন যার মধ্যে 'স্ট্রাইকার' (১৯৭৪)[১২] ও 'কোনী' (১৯৭২)[১৩] খুবই বিখ্যাত। 'কোনী' উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এখনো সমান আকর্ষণীয়। এই গ্রন্থগুলি বাংলা ক্রীড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ক্রীড়া ইতিহাস, ক্রীড়া দর্শন, ক্রীড়া তত্ত্ব ইত্যাদি ক্রীড়া সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে খুব বেশী লেখা নজরে পড়ে না। শঙ্কর সেনগুপ্তের 'বাঙালীর খেলাধূলা' (১৯৭৬)[১৪] গ্রন্থেই প্রথম চোখে পড়ে খেলাধূলার মৌলিক কতকগুলি দিক। এই গ্রন্থে খেলাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে এবং তার বিন্যাস, গঠন, কার্যকারিতা নিয়ে তথ্য ও গবেষণামূলক বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। শঙ্কর সেনগুপ্ত অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলোচনার দ্বারা দেখিয়েছেন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মত বাঙালী আপন শরীরকে শক্ত সামর্থ্য করতে, প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে লড়তে ও বুদ্ধি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করতে প্রাচীন যুগ থেকেই নানাবিধ শারীরিক ক্রীড়ায় সামিল হয়েছে। এই ক্রীড়াগুলি কিছু কিছু ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে আবার কিছু কিছু সীমানা ছাড়িয়ে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে নগর সভ্যতার উন্নতি ও বিদেশী আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী খেলাও সাবলীল ভাবে দেশজ খেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। শঙ্কর সেনগুপ্ত

বাঙালীর নিজস্ব খেলাগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন এবং বিন্যাস অনুযায়ী কিছু কিছু খেলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মূলতঃ খেলাগুলিকে স্থলের খেলা, জলের খেলা, অন্তরীক্ষের খেলা, ছোটদের খেলা, ধর্মীয় খেলা, পশুপ্রাণী ও বুদ্ধির খেলা ইত্যাদি ভাগে ভাগ করেছেন। খেলার শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে তিনি আরও দুটি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন যেমন প্রতিযোগিতা মূলক, প্রতিযোগিতা বিহীন, উপকরণ যুক্ত, উপকরণ বিহীন।

ড. মানস মজুমদার (১৯৮৫)[১৫] তাঁর একটি লেখায় দেখিয়েছেন খেলার ছড়াগুলির মধ্যে নৃতাত্ত্বিক উপাদান। তিনি লিখেছেন যে, একজন নৃ-বিজ্ঞানী চেষ্টা করেন আদিকাল থেকে বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন ধারা বহমান তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে। মানব সভ্যতার বিবর্তন বৈচিত্র্যের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে থাকেন নৃতত্ত্ববিদ। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বাংলার কিছু প্রচলিত লোকক্রীড়ায় যে ছড়া ব্যবহার হয়, নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তার ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন - 'গাচ্ছুয়া-গাচ্ছুয়া' খেলাটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন হিংস্র প্রাণীকুলের আক্রমণ প্রতিরোধের প্রয়োজনে মানুষ গাছের উপর আশ্রয় নিত এবং চাতুর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহায়তায় আত্মরক্ষা করত। একদা অরণ্য সংলগ্ন মানুষের কাছে যা ছিল জীবন সংগ্রামের অঙ্গ পরবর্তীকালে তা খেলায় পর্যবসিত। যা বস্তুতঃ পক্ষে মানুষের আরণ্যক জীবনের স্মৃতিবাহী। 'হাডুডু' খেলাটিকেও তিনি প্রাচীন কালের মানুষের গোষ্ঠী যুদ্ধের স্মৃতিবাহী বলে উল্লেখ করেছেন। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই খেলা মানুষের প্রাচীন কালের জীবন যাত্রার মধ্যে যে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ছিল সেই পরম্পরার অনুকৃতি সম্বলিত।

ড. অসীম দাস (১৯৯১)[১৬] লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে করেছেন তার 'বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি একদিকে লৌকিক ক্রীড়ার সঙ্গে সংস্কৃতির সংযোগ এবং লৌকিক ক্রীড়া যে জীবনানুকৃতি তা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে বিশেষ কয়েকটি লোকক্রীড়ার সামাজিক উৎস নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা থেকে অতীত দিনের সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যেমন ধারণা করা যায় তেমনি ক্রীড়া জীবানুকৃতি এই তত্ত্বটিকে মেনে নিয়ে সমাজে প্রচলিত রীতিগুলি যে খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁর লেখার মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর লেখার মধ্যে তিনি উপস্থাপন করেছেন আদিম গোষ্ঠী জীবনের সংগ্রাম, আদিম সমাজের বিবাহ ও যৌনাচার এবং তার সূত্র ধরে লৌকিক ক্রীড়া। যাদু, আচার, সংস্কার ও লৌকিক ক্রীড়ার সঙ্গে ধর্মের যোগসূত্রগুলি এই গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ কবেছেন। লৌকিক ক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধানের চাইতে তিনি লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস সম্পর্কে বেশী আগ্রহী ছিলেন। তুলনামূলক ভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, ড. অসীম দাস কয়েকটি লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস নিয়ে যে গভীর আলোচনা করেছেন তা এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য গবেষক বা লেখকরা তেমন ভাবে আলোকপাত করেননি। সামাজিক উৎসের আলোচনায় তাঁর 'এক্কাদোক্কা' — সূচাগ্র মেদিনীর অধিকার, 'গাদি' — অশ্রুসিক্ত লবণের স্বাদ, 'উপেনটি বাইস্কোপ' — কামিনী ভোগের চালচিত্র প্রভৃতি আলোচনাগুলি মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

গ্রাম বাংলার প্রচলিত 'সাতচাড়া' বা 'পিট্টু' খেলাটিকে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ড. অসীম দাস দেখিয়েছেন যে লোকক্রীড়ার মধ্যে সুদূর অতীতের স্মৃতিকণাগুলি কি ভাবে রূপান্তরিত প্রকরণে পুঞ্জিত হয়ে থাকে। তাঁর মতে প্রাচীন কালে আর্যভাষীগণ সিন্ধু সভ্যতার নাগরিকগণের ধন সম্পদের লোভে ব্যাপক লুণ্ঠন এবং লুণ্ঠনকে অবাধ করতে নগর দুর্গগুলির ধ্বংস সাধন করত। সেই ধ্বংস লীলার প্রক্রিয়াটি 'সাতচাড়া' লোকক্রীড়ার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে আছে। 'সাতচাড়া' খেলায় একটি দল 'পুরন্দর' অন্য দলটিকে 'দস্যু' বলার রীতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। তাঁর মতে সাতচাড়া খেলায় ব্যবহৃত খোলামকুচির স্তম্ভ সিন্ধু উপত্যকার নগর দুর্গের প্রতীক। 'পুরন্দর' অর্থাৎ আক্রমণকারীর বলের আঘাতে অর্থাৎ বজ্রের আঘাতে খোলামকুচির স্তম্ভটিকে ধ্বংস করছে। অপরদিকে ঐ নগর সভ্যতার অধিবাসীগণ যারা 'দস্যু' নামে পরিচিত দূর্গটিকে পুনর্নির্মাণ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। 'সাতচাড়া' খেলা সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের প্রতীক এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঋগ্বেদ থেকে কয়েকটি পংক্তির তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠিত গবেষক ও অধ্যাপকদের প্রশংসা পেয়েছে।

ড. অসীম দাস তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, লোকক্রীড়া একটি সৃষ্টি কর্ম। সামাজিক উপাদান থেকে নির্বাচিত ঘটনা প্রবাহ যা সম্ভবতঃ অতীত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে যেমন সাহিত্য বা অন্য শিল্পকর্ম সৃষ্টি হয় তেমনিভাবে লোকক্রীড়াও কিছু অত্যুৎসাহী মানুষের সৃষ্টি কর্ম। লোকক্রীড়া বিস্মৃত সমাজের প্রকৃত জীবন ছবিটিকে ধরে রাখে। সেই হিসাবে লোকক্রীড়া ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবেও ঐতিহাসিকদের কাজে লাগতে পারে। অবশ্য একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা সব সময় লোকক্রীড়ায় প্রতিভাত হয়নি। যেমন নীল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি নিয়ে লোকক্রীড়া সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়নি।

নির্মলেন্দু ভৌমিক (১৯৯৩)[১৭] লোকসংস্কৃতির তাৎপর্য, তার প্রসার ও ব্যাপ্তি বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে একটি আদিম খেলা নিয়ে অত্যন্ত গভীর বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা ধর্মী লেখা লিখেছেন। 'লুকোচুরি খেলা : পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বিস্তার ও বৈচিত্র্য' এই লেখাটি লৌকিক ক্রীড়া বিষয়ে গবেষকদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। 'লুকোচুরি' খেলাটিকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন এবং তার বিস্তার ও বৈচিত্র্য অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। 'পলায়ন' এবং 'খোঁজা' লুকোচুরি খেলার মূল কথা। 'চোর' শব্দটি তিনি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন। যেহেতু চোর সমাজের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে এবং এই খেলার মধ্যেও অনেকেই আত্মগোপন করে থাকে কিন্তু একজন খুঁজে বেড়ায়। সেই জন্য আত্মগোপনকারীদের খুব সহজেই চোর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই খেলাটির উৎস সম্পর্কে আলোচনায় তিনি শিকারী এবং পলায়নপর অথবা আত্মগোপনকারী পশুর পশ্চাদ্ধাবন করার যে পদ্ধতি আদিম সমাজে প্রচলিত ছিল তার অনুকৃতি এই খেলায় রয়েছে বলে অনুমান করেছেন। অন্যদিকে লুকোচুরি খেলা থেকে রূপান্তরিত হয়ে 'চোর পুলিশ' খেলা প্রচলিত হয়েছে। সেখানেও আত্মগোপন, পলায়ন এবং খোঁজা বিষয়টি প্রতিভাত হয়, যা সমাজে চোর ও পুলিশের কাজের মধ্যে

লক্ষ্য করা যায়।

এই খেলাটির বিভিন্ন রূপান্তর নিয়ে তিনি বিশ্লেষণও করেছেন এবং তাদের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন, যেমন - স্থলে লুকোচুরি খেলা, জলে খেলা, গাছে খেলা, চোখ বেঁধে খেলা, খোঁজা, অভিনয় করা ইত্যাদি। মোট ২৭টি ধরনের লুকোচুরি খেলার বিভিন্ন রূপান্তর বিশ্লেষণ করে তিনি এই লেখায় তাঁর বিবরণ ও লোকক্রীড়ার Motif চিহ্নিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে লুকোচুরি খেলার রূপান্তরিত নামগুলিকে তার এই লেখায় লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন লুকালুকি, লুকলুকানি, কুকলুকাঁই, পলাপলি, পাইলাটু, নুকাটুনু ইত্যাদি। Motif নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে, খেলাগুলির রূপান্তর ঘটলেও Motif এর মধ্যে একটি সমন্বয় আছে। নাম যাই হোক বেশীর ভাগ খেলার Motif হয় দেখা, ছোয়া, খোঁজা অথবা চিহ্নিত করা, ধাওয়া করা, ধরা, অভিনয় ইত্যাদি।

লোকসংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত (১৯৯৫)[১৮] সংস্কৃতি বিজ্ঞানী আর্চার টেলরকে উল্লেখ করে লিখেছেন যে — "ছেলেখেলা বলে যাকে আমরা স্নেহ এবং উপেক্ষার চোখেই দেখতে অভ্যস্ত, বস্তুতপক্ষে তার মধ্যে 'ছেলেমি' এবং 'খেলার' ভাগটুকু নেহাৎই আপেক্ষিক; প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের সামাজিক বিবর্তনের অজস্র স্মৃতিই তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।" স্মরণাতীত কাল থেকে এ অবধি মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে ক্রমোত্তরণ ঘটেছে তার স্মৃতি রেণু এই সব খেলার মধ্যে জমে রয়েছে। কালের বিবর্তনে তাদের প্রাথমিক তাৎপর্য টুকু শুধু ঢাকা পড়ে গেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, লৌকিক ক্রীড়ার মধ্যে আমাদের আর্থ সামাজিক ইতিহাসের প্রত্নাবশেষ নানা আবরনে আত্মগোপন করে আছে। বহিরাঙ্গিক তাৎপর্য এখন যাই হোক না কেন মূলে তাদের অর্থ ছিল আলাদা।

'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' গ্রন্থে অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত কয়েকটি সুপরিচিত লোকক্রীড়ার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ধারা সম্পর্কে মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন কতকগুলি আদিম সংস্কার বিচিত্র ভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে 'কানামাছি' খেলায়। তেমনি আদিম আরণ্যক জীবনের স্মৃতিকণা জড় হয়ে আছে 'কুমির কুমির' খেলার মধ্যে। 'চোর চোর' খেলা ও 'চোর পুলিশ' খেলা দুটিকে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এই খেলাগুলি আসলে 'কুমির কুমির' খেলারই একটি আধুনিক রূপান্তর। আদিম জীবনের রীতিনীতি, বিধি-বিধান, বিবাহ প্রথা এবং নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক কি ভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার বেশ খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় 'বউবাসন্তি' 'জোড়বাঁধাবাঁধি' প্রভৃতি খেলা গুলির মধ্যে। 'হাডুডু', 'কাবাডি', 'গাদি', 'এক্কাদোক্কা' খেলাগুলির মধ্যে জমির অধিকার জনিত দ্বন্দ্ব-ই এই খেলাগুলির উৎস বলে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা অন্য অনেক গবেষকদের লেখার মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং জেলায় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মেচ সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করেন। এরা বৃহৎ ইন্দো-মোঙ্গলীয় মহাজাতি পরিবারের অন্তর্গত বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এদের ভাষার নাম 'বোড়ো'। প্রমোদ নাথ 'সেতুবন্ধন' পত্রিকায় (১৯৯৯)[১৯] 'মেচ জনজীবনে ছড়ায় খেলাধূলা' নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেছেন। কয়েকটি পরিচিত খেলা এবং কয়েকটি ঐ অঞ্চলে প্রচলিত খেলার

বিবরণ ও ছড়াগুলিকে তাঁর লেখায় উপস্থাপিত করেছেন। কোন একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত খেলা এবং এই খেলায় ব্যবহৃত তাদের ভাষায় ছড়া এই লেখায় উপস্থাপন করে আমাদের জানার পরিধি বিস্তৃত করেছেন।

অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে' (১৯৯৯)[২০] ও 'বাঙলার লোকক্রীড়া' (২০০১)[২১] গ্রন্থ দুটিতে লোকক্রীড়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে তথ্য মূলক আলোচনা করেছেন। একদিকে তিনি লোকক্রীড়ার সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে লোকক্রীড়ার শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। পরিশীলিত ক্রীড়ার সঙ্গে লোকক্রীড়ার সাযুজ্য ও পার্থক্য নিয়ে তুলনা মূলক আলোচনা করেছেন। এই অংশটি উপস্থাপনায় অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়াও সমসাময়িক সময়ের অন্যান্য লেখকদের মত তিনিও লোকক্রীড়ার নৃতাত্ত্বিক প্রতিফলন, ঐতিহাসিক উপাদান, ছড়া, অভিনয়ধর্মী লোকক্রীড়া এই বিষয়গুলিও তিনি আলোচনার মধ্যে রেখেছেন। লোকক্রীড়ায় গণিত শীর্ষক আলোচনাটিতে নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। লোকক্রীড়ার মাধ্যমে শিশুরা কি ভাবে সংখ্যা গণনা শিখতে পারে সে দিকেও তিনি আলোকপাত করেছেন। যাদু বিদ্যার প্রভাব কয়েকটি লোকক্রীড়ায় লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক চক্রবর্তী তার গ্রন্থে কয়েকটি লোকক্রীড়া, যেগুলির সঙ্গে যাদুবিদ্যার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় সে গুলি আলোচনা করেছেন। লোকক্রীড়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে অধ্যাপক চক্রবর্তী বেশ কয়েকটি লোকক্রীড়ার বিবরণ তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এই সংকলনের মধ্যে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য লোকক্রীড়াও আছে যা ভবিষ্যতে গবেষকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হবে।

অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত লোকসাহিত্যের লেখকদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা যে লোকক্রীড়া সম্পর্কে তেমন কোন আলোকপাত করেননি তাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি ড. অসীম দাসের লেখা সযত্নে সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে. লোকক্রীড়ার সঠিক সংজ্ঞা ড. দাসের লেখা থেকেও নিরূপণ করা শক্ত। অধ্যাপক অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী অনেকাংশে মেনে নিয়েও ঐ সংজ্ঞাটির সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য লেখকদের লেখার তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি লোকক্রীড়ার একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। লোকক্রীড়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলির ভিত্তিতে তিনি লোকক্রীড়ার সংজ্ঞার প্রস্তাব রেখেছেন।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া' (২০০১)[২২] গ্রন্থে লোকক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য এবং সেই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে খেলাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করার চেষ্টা করেছেন। সীমান্ত বাংলার, বিশেষ করে পশ্চিম সীমান্তের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার কিছু প্রচলিত লোকক্রীড়ার উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ তাঁর এই গ্রন্থে রয়েছে। কয়েকটি লোকক্রীড়ার সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনাও এই গ্রন্থে রয়েছে। কয়েকটি খেলাব বিবরণ তিনি এই লেখায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভাবে তুলে ধরেছেন, যেমন — 'বাগড়ী', 'মশা খেদা', 'ফরিখেল', 'কইড়া', 'ভেজাবিধা' ইত্যাদি। এই খেলাগুলির বিবরণ অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের লেখায় চোখে পড়েনি।

প্রদ্যোৎ কুমার মাইতি 'মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে (২০০১)[২৩] লোকক্রীড়া নিয়ে

একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এই লেখায় কয়েকটি প্রচলিত খেলা ও ছড়ার উল্লেখ করেছেন যা অন্যান্য গবেষকদের লেখায়ও লক্ষ্য করা গেছে। কয়েকটি প্রচলিত খেলায় মেদিনীপুর জেলায় ব্যবহৃত ছড়াগুলির তিনি উল্লেখ করেছেন।

সত্যজিৎ নাহা 'ত্রিপুরার আদিবাসীদের আবহমান খেলাধূলা' '(২০০২)[২৪] নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত বেশ কয়েকটি খেলার চিত্র সহকারে বর্ণনা করেছেন। বেশ কয়েকটি খেলার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত লোকক্রীড়ার সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। মুসোক খাইলাই থীং মুং (ষাঁড় যুদ্ধ খেলা), রিবুধু থীং মুং (গামছা বল খেলা), ইয়ংলা বাইম খাইম থীং মুং (ব্যাঙ লাফানো দেড় খেলা) এই খেলাগুলি ত্রিপুরার আদিবাসী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকক্রীড়াগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্নধর্মী।

তথ্যসূত্র

১। Das, Shankar Nath **Physical Education, Games and Recreation in Early India,** The Upper India Publishing House Pvt. Ltd. Aminabad, Lucknow, 1985.

২। Van Dalen, Deobold B. and Bene H Bruel L. : **A World History of Phys'cal Education,** Englewood Clifs Inc. Prentice Hall, 1971.

৩। সেন, রথীন্দ্র কুমার : **শারীর শিক্ষার ইতিহাস,** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০।

৪। Hacken, Smith C. : **History of Physical Education,** New York, Herper and Row, 1966.

৫। Shephard, R. J. : **Physical Activity and Growth,** Year Book. Medical Publishers, Inc., Chikago, London, 1982.

৬। Khan, Eraj Ahmed : **History of Physical Education,** Scientific Book Company, Patna, 1964.

৭। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : **বাংলার লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া,** ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩।

৮। সিদ্দিকী, আশ্‌রাফ : **লোকসাহিত্য,** প্রথম খণ্ড, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭।

৯। আহমদ, ওয়াকিল : **বাংলার লোকসংস্কৃতি**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭।

১০। দত্ত, অমল : **ফুটবল খেলতে হলে**, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৯।

১১। দত্ত, অমল : **ঘেরা মাঠ ছড়ানো গ্যালারী**, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭২।

১২। নন্দী, মতি : **স্ট্রাইকার**, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭২।

১৩। নন্দী, মতি : **কোনি**, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৪।

১৪। সেনগুপ্ত, শঙ্কর : **বাঙালীর খেলাধূলা**, ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬।

১৫। মজুমদার, মানস : **লৌকিক সৃজনী**, পাইওনিয়ার ওয়ার্কস, মালদা, ১৯৮৫।

১৬। দাস, অসীম : **বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস**, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১।

১৭। ভৌমিক, নির্মলেন্দু : **লোকশ্রুতি**, (১০ম সংখ্যা), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ১০১-১২৩।

১৮। সেনগুপ্ত, পল্লব : **লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ**, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫।

১৯। নাথ, প্রমোদ : **সেতু বন্ধন (তৃতীয় সংকলন)**, সেন্টার ফর কম্যুনিকেশান এ্যাণ্ড কালচারাল এ্যাকশন, কলকাতা, ১৯৯৯।

২০। চক্রবর্তী, বরুণ কুমার : **লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে**, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা ১৯৯৯।

২১। চক্রবর্তী, বরুণ কুমার : **বাঙলার লোকক্রীড়া**, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।

২২। মুখোপাধ্যায়, সুব্রত : **সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া**, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।

২৩। মাইতি, প্রদ্যোৎ কুমার : **মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি**, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, তমলুক, মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।

২৪। নাহা, সত্যজিৎ : **ত্রিপুরার আদিবাসীদের আবহমান খেলাধূলা**, আবহমান, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম সংস্করণ, ২০০২।

তৃতীয় অধ্যায়
তথ্যানুসন্ধানের অনুসৃত পদ্ধতি

যে কোন বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গবেষণা ও অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন। বর্তমান গ্রন্থটির তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। 'লোকক্রীড়া' যেহেতু লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, তাই লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন পদ্ধতি বিশেষ ভাবে অবলম্বন করা হয়েছে।[১] আলোচ্য গ্রন্থটির ক্ষেত্রে আমরা মূলতঃ ক্ষেত্র সীমাক্ষার উপর নির্ভর করেছি। কেননা তাত্ত্বিক আলোচনা যদি সংগৃহীত উপাদান নির্ভর না হয় তবে সে আলোচনা অনেকাংশে গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। ক্ষেত্র সমীক্ষার পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ ঃ—

১। ক্ষেত্র সমীক্ষা অঞ্চল নির্বাচন ঃ

প্রথমে তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা অঞ্চল নির্বাচন করা হয়েছে। এই সব অঞ্চলের মধ্য থেকে লোকক্রীড়ার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে এমন প্রতিনিধিত্বমূলক একাধিক অঞ্চল নির্বাচন করে ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রাক্ সমীক্ষা পর্বের তথ্য বিশ্লেষণ করে অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

২। তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ

প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে, ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে দুধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যথা — (ক) নমুনা সমীক্ষা পদ্ধতি এবং (খ) উপাদান সংগ্রহ পদ্ধতি।

(ক) নমুনা সমীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে - অবাধ সমীক্ষা (Random Sampling), স্তরানুসারী সমীক্ষা (Stratified Sampling), উদ্দেশ্যমুখীন সমীক্ষা (Purposive Sampling), মিশ্র সমীক্ষা (Mixed Sampling), নিয়মানুগ সমীক্ষা (Systematic Sampling) ও নিয়মিত ব্যবধান মূলক সমীক্ষা (Sampling by regular interval) পদ্ধতি তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান গ্রন্থে প্রথম পাঁচটি পদ্ধতি তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) উপাদান সংগ্রহ পদ্ধতির ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ (Observation), সাক্ষাৎকার (Interview), প্রশ্ন-প্রতিবাক্য তালিকা (Questionaires and Schedule) এবং বিষয় সমীক্ষা (Case Study) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ ঃ

ক্ষেত্রানুসন্ধানে 'পর্যবেক্ষণ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পর্যবেক্ষণের

দুটি ভাগকেই ক্ষেত্রসমীক্ষায় কর্মে ব্যবহার করা হয়েছে। যথা - অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ (Non-controlled Observation) এবং নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ (Controlled Observation)। অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের দুটি ভাগের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (Non-controlled participant Observation)-কে ব্যবহার করা হয়েছে। কারন লোকক্রীড়া বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ অনেক বিজ্ঞানসম্মত। অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণমূলক ক্ষেত্রানুসন্ধানে গবেষক ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থাকেন, গ্রাম্য লোকালয়ে অবস্থান করেন। এর ফলে জনজীবনে জড়িয়ে পড়ার ফলে জনসাধারণের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্বভাবতঃই তথ্য সংগ্রহ অনেক গ্রহণযোগ্য হয়।

সাক্ষাৎকার ঃ

এই গ্রন্থের কর্মে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরও একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, যা সাক্ষাৎকার বা Interview পদ্ধতি নামে পরিচিত। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি চারটি ধারায় বিভক্ত — স্বতঃস্ফূর্ত বা নির্দেশবিহীন সাক্ষাৎকার (Non-directive Interview), উদ্দেশ্যমুখীন বা নির্দেশানুযায়ী সাক্ষাৎকার (Direct Interview), কেন্দ্রীভূত বা সুসংহত সাক্ষাৎকার (Integrated Interview) এবং সুগভীর বা গভীরতামূলক সাক্ষাৎকার (Depth Interview)। বর্তমান গ্রন্থের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত সাক্ষাৎকার, উদ্দেশ্যমুখীন সাক্ষাৎকার ও কেন্দ্রীভূত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত সাক্ষাৎকারের আলোচ্য বিষয় উত্তরদাতার ইচ্ছানুসারে আলোচনা এবং আলোচনার স্বতঃ প্রবাহিত ধারা থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ। এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতাই মুখ্য। উদ্দেশ্যমুখীন সাক্ষাৎকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রশ্নকর্তা মুখ্য স্থান অধিকার করেন এবং তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সাক্ষাৎকার কর্ম পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীভূত সাক্ষাৎকারে পূর্ব পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা ব্যবহৃত হয় এবং বিশিষ্ট ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আলোচ্য গ্রন্থে উপরোক্ত তিনটি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছে। গভীরতা মূলক সাক্ষাৎকার পদ্ধতি তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি। কারণ এই পদ্ধতি মূলতঃ মনঃ সমীক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন প্রতিবাক্য তালিকা ঃ

ক্ষেত্রানুসন্ধানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচারিত প্রশ্নপ্রতিবাক্য তালিকা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সংগঠিত (Structured) এবং অসংগঠিত (Unstructured) ধারায় বিভক্ত। সংগঠিত প্রশ্নতালিকা আবার দুটি উপধারায় বিভক্ত — অবাধ (Open-end) এবং সীমিত (Close-end)। অবাধ প্রশ্ন তালিকায় শুধুমাত্র প্রশ্ন থাকে এবং উত্তরদাতা ইচ্ছেমত উত্তর দিতে পারেন। সীমিত প্রশ্ন তালিকায় প্রশ্ন এবং সেই সঙ্গে সম্ভাবিত উত্তর লিপিবদ্ধ থাকে, উত্তর দাতা যাতে 'হ্যাঁ' - 'না' অনুযায়ী উত্তর দান করেন। অসংগঠিত প্রশ্ন তালিকায় কোন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে না, প্রয়োজনীয় বিষয় ও সাধারণ জিজ্ঞাসার 'ছকমাত্র' লিপিবদ্ধ থাকে। প্রশ্নকর্তা উপস্থিত হয়ে প্রয়োজন ও ইচ্ছানুসারে স্বাধীন ভাবে আগে বা পরে প্রশ্ন করেন

সেই অর্থ হল 'Metafolklore'। অর্থাৎ লোকের (Folk-এর) চোখ দিয়ে লোকসংস্কৃতি দেখা বা মূল্যায়ন। যারা লোকসংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টি করে ও চর্চা করে বা লালন পালন করে, তাদের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা কি? সেই ধারণাকে বিচার-বিবেচনায় এনে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন করাই এই তত্ত্বের মূল কথা।[৭৮] বর্তমান গ্রন্থে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা তথ্য সংগ্রহকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

এক নজরে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ

ঐতিহ্য নির্ভর লোকক্রীড়ার গবেষণার ক্ষেত্রে ক্ষেত্র সমীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই সূত্রে আলোচ্য গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্ষেত্র সমীক্ষার সমগ্র কর্ম পদ্ধতিকে প্রধান তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে—

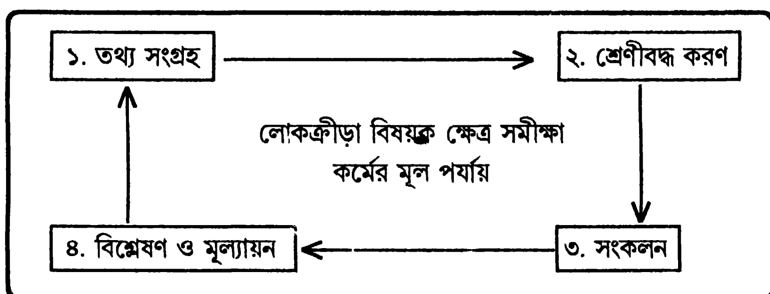
১। প্রাক্ ক্ষেত্র সমীক্ষা পর্ব বা Pre Field Work

২। ক্ষেত্র সমীক্ষা পর্ব বা Field Work এবং

৩। পরবর্তী ক্ষেত্র সমীক্ষা পর্ব বা Post Field Work

উপরোক্ত কর্ম বিভাজনের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে লোকক্রীড়া বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ বিজ্ঞান সম্মত ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লোকক্রীড়া বিষয়ক ক্ষেত্র সমীক্ষা প্রধানতঃ চারটি পর্যায়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। প্রথমতঃ লোকক্রীড়া বিষয়ক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, দ্বিতীয়ত সংগৃহীত তথ্য গুলিকে পর্যায়ক্রম অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, তৃতীয়তঃ সংগৃহীত তথ্যগুলিকে যথোপযুক্ত ভাবে সংকলন করা হয়েছে এবং চতুর্থতঃ লোকক্রীড়া সম্পর্কিত তথ্যগুলির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। পর্যায় গুলিকে নিম্নোক্ত ছক এর সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে —



তথ্যসূত্র

১। চট্টোপাধ্যায়, তুষার : **লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান,** এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৮৫।

২। Kenneth, S. Goldstein : **A Guide for Field Workers in Folklore,** U.S.A., 1964.

৩। Claus, Peter J. and Frank Korom : **Performance and Performing Theories in Folkloristics and Indian Folklore,** Udupi Regional Resource Centre, 1991.

৪। Mahmud, Firoz : **Prospects of Material Folk Culture Studies and Folklife Museums in Bangladesh,** Bangla Academy, Dhaka, 1993.

৫। ইসলাম, মযহারুল : **ফোকলোর ঃ পরিচিতি ও পঠন-পাঠন,** বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৩।

৬। আহ্মদ, ওয়াকিল : **লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ,** বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯।

৭। মণ্ডল, সুজয় কুমার : **লোকসংস্কৃতির ত্রিবলয়,** 'সেতুবন্ধন' প্রকাশনা, সেন্টার ফর কম্যুনিকেশান অ্যাণ্ড কালচারাল অ্যাক্শন, ৫/১১, রাইফেল রেঞ্জ রোড, কলকাতা ১৯৯৯।

৮। Dundes, Alan : **Metafolklore and Oral Literary Criticism,** The Monist, 1966.

চতুর্থ অধ্যায়
লোকক্রীড়ার শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ

খেলোয়াড় বিভাজন ও চোর নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

লোকক্রীড়ায় খেলোয়াড় বিভাজন, চোর নির্বাচন বা খেলা শুরু করবার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। শিষ্ট ক্রীড়াগুলিতে যেমন 'টস' এর মাধ্যমে খেলা শুরু হয় লোকক্রীড়ায় এমন পদ্ধতি দেখা যায় না। ক্রীড়া ভেদে এই পদ্ধতিগুলির তারতম্য রয়েছে। কোন খেলায় ছড়া, কোন খেলায় আঙ্গুল ফোটানো, আবার কোন খেলায় কাঠি টানা, পাতা আনা প্রভৃতি পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেগুলি বৈচিত্র্যে ভরা। পছন্দ অনুযায়ী পদ্ধতিগুলি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে কিছু পদ্ধতি তুলে ধরা হল।

১. হাতের তালু ঃ এই পদ্ধতিতে তিনজন করে খেলোয়াড় এক সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। তিনজন খেলোয়াড় একত্রিত হয়ে একসঙ্গে হাতের তালু সমমুখী অথবা বিপরীত মুখী করে। তিনজনের মধ্যে যে আলাদা করে সে উঠে যায়। অর্থাৎ তিনজনের দুজন একরকম এবং অন্যজন অন্যরকম করলে অন্যজন উঠে যায়। এই ভাবে চলতে থাকে। শেষে দুজন থাকলে উঠে যাওয়ার মধ্য থেকে একজন তাদের সঙ্গ দেয় এবং সে যা করে বাকি দুজনের মধ্যে একজন তা করতে পারলে উঠে যায়। অবশিষ্ট জন 'চোর' নির্বাচিত হয়।

২. আঙুল ধরা ঃ খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে একজনকে দলনেতা বা নেত্রী নির্বাচিত করা হয়। দলনেতা জামার নীচে বা শরীরের পেছনে হাত নিয়ে একটি আঙুল সশব্দে ফোটায়। তারপর হাতটি জামা থেকে বের করে শরীরের সামনে এনে সবাইকে একটি করে আঙুল ধরতে বলে। ফোটানো আঙুলটি যে ধরে সে 'চোর' নির্বাচিত হয়।

৩. কাঠি টানা ঃ দলনেতা একটি কাঠি দুই হাতের মধ্যে ধরে থাকে। এবার খেলোয়াড়রা সবাই সেই কাঠিটি একটু একটু করে টানতে শুরু করে। এই টানার ফলে কাঠিটিও একটু একটু করে বেরিয়ে আসে। যার টানে দলনেতার হাত থেকে পুরোটাই বেরিয়ে আসে সেই 'চোর' নিবার্চিত হয়।

৪. ধুলোয় ফুঁ বা বালিতে ফুঁ ঃ কিছু পরিমাণ ধুলো বা বালির নীচে একটি কাঠি বা পাতা রাখা হয়। এবার সমস্ত খেলোয়াড় সেই ধুলোয় বা বালিতে একে একে ফুঁ দেয়। ফুঁ দেবার ফলে ধুলো বা বালি সরে যায়। যার ফুঁতে ধুলো বা বালি সরে গিয়ে কাঠিটি বেরিয়ে পড়ে সেই চোর নির্বাচিত হয়।

৫. উবু, দশ, কুড়ি ঃ এই পদ্ধতিতে সমস্ত খেলোয়াড়রা বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। একজন দলনেতা থাকে। দলনেতা সবাইকে একে একে স্পর্শ করে গণনা শুরু করে —

উবু, দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই, শ'।

শেষ কথাটি বা 'শ' কথাটি যার গায়ে পড়ে সে উঠে যায়। এই ভাবে যেতে যেতে শেষে যে থাকে সে 'চোর' নির্বাচিত হয়।

৬. পাতা ছেঁড়া ঃ এই পদ্ধতিতে যে কোন একজন খেলোয়াড়ের সমসংখ্যক পাতা হাতের মধ্যে রাখে। এই পাতাগুলির মধ্য থেকে একটি পাতা সবার অলক্ষ্যে ছিঁড়ে বা ফুটো করে রাখে। এবার সবাইকে পাতাগুলি একে একে টানতে বলে। যে ছেঁড়া পাতাটি টানে সে 'চোর' নির্বাচিত হয়।

৭. পাতা আনা ঃ এই পদ্ধতিতে খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে দুজন 'রাজা' নির্বাচিত হয়। এবার খেলোয়াড়বা দুজন দুজন করে জোড় বাঁধে। জোড় বাঁধার পর দুজন কোন গোপন স্থানে গিয়ে নিজেদের ছদ্মনাম গ্রহণ করে। নামগুলি সাধারণতঃ দূর্ব্বাঘাস, গোলাপফুল, মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রকৃতি বিষয়ক হয়ে থাকে। এবার জোড় খেলোয়াড়রা রাজাদের সামনে এসে বলে - 'ডাক ডাক কিস্‌কো ডাক?' যে কোন একজন রাজা তখন উত্তর দেয় 'হামকো মেরী তুমকো ডাক'। অর্থাৎ সেই রাজার ডাক দেবার পালা। এবার জোড় খেলোয়াড়রা তাদের ছদ্মনাম বলে — কে নেবে মাটি, কে নেবে দূর্ব্বাঘাস? রাজা অনুমান করে যে কোন একটি চায়। যদি দূর্ব্বাঘাস চায় তবে যার ছদ্মনাম দূর্ব্বাঘাস সে ডাক দেওয়া রাজার পক্ষে যায়, অন্যজন বিপরীত রাজার পক্ষে যায়। দ্বিতীয়বার অন্য রাজার ডাক দেওয়ার পালা। এভাবে পর্যায়ক্রমে ডাকের মাধ্যমে খেলোয়াড়রা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। খেলোয়াড় সংখ্যা অবশ্যই সমসংখ্যক হবে।

৮. ছড়া পদ্ধতি ঃ এ ছাড়াও এই চোর নির্বাচনের ক্ষেত্রে বা খেলা শুরুর ক্ষেত্রে প্রচুর ছড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যে ছড়াগুলির মধ্যে দৃঢ় সংঘবদ্ধতা ও রচনার চারুতা সব সময় লক্ষ্য করা যায় না। ছন্দ এবং তালই ছড়াগুলির মূল কথা।

ক) ইংপিং সেপ্টি কিন,
খোকা খায় ভিটামিন,
ভিটামিনে পোকা,
ডাক্তার বাবু বোকা।

খ) একতলা-দুইতলা
পুলিশ গেল নিমতলা,
পুলিশের হাতে ঝাঁটার কাটি,
ভয় পায় না কংগ্রেস পার্টি।

গ) টুল টুল টুলকি,
নীলকা গাছের ফুলকি,
বেড়া টোপে ঝুলছে,
খুকু কেঁদে ভুলছে।

ঘ) কা কা কা
আমরা কাকের ছা,
তোরা সবাই পুঁচকে পাখী,
তফাৎ হয়ে যা।

ঙ) এ্যাকোড়, ব্যাকোড়, ত্যাকোড় শাইল,
কাইল পরশু মঙ্গলবার,
কড়ি গণে মজুমদার,
ধানের আগা নলের শিষ,
খাইয়া ডোবা উনিশ বিশ।

চ) উতু টুকু চিকনি শাক
কি দিয়ে রাঁধবি?
ঘরে আছে বুড়ো জামাই
কি বলে ডাকবি?
বাপ বলে ডাকবি।

ছ) নাড়া ওল বেগুন তোল
বেগুন কি সস্তা,
নাড়ার কি অবস্থা।

জ) রাম দুই সাড়ে তিন
অমাবস্যায় ঘোড়ার ডিম।
রবিবারে হাঁসের ডিম।
এক-দুই-তিন।

ঝ) সবুজ পাখী নমস্কার,
পা দুটি পরিষ্কার,
মাথার ফিতে কালো
বর দেখতে ভালো।

ঞ) ইচিং বিচিং চিচিং চা
প্রজাপতি উইড়্যা যা।

ট) চড়াই পাখী বারোটা,
ডিম পেড়েছে তেরোটা,

একটা ডিম নষ্ট
চড়াই পাখীর কষ্ট।

ঠ) উবু দাসের দোতলা বাড়ী
কাক বসেছে সারি সারি,
ওমা তোমার পায়ে পড়ি
বউ এনে দাও খেলা করি
বউ এর মাথায় কালো চুল,
কোথায় পাব গোলাপ ফুল,
গোলাপ ফুলের ছড়াছড়ি,
চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি।

ড) উবু, দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ,
ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই, শ',
শয়ে শয়ে মিলে গেল,
প্রজাপতি উড়ে গেল,
প্রজাপতির নাম কি?
দুর্গা ঠাকুর মাই কি।

ঢ) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগার,
বার, তের, চোদ্দ, পনের, ষোল, সতের, আঠার, উনিশ, কুড়ি
যে খায় ঝাল মুড়ি
তার বাবার মোটা ভুঁড়ি।

ণ) উবু, দশ, কুড়ি,
নাড়ি ভুঁড়ি
ইলিশ মাছের চচ্চড়ি।
ওগো মা খেতে দাও —
অজা-গজা খাব নাই —
শহর- বাজার যাব —
কালিদাসের পুঁথি পইড়ব
অ-ধ-ম।

প্রত্যেকটি ছড়াতেই শেষ কথাটি যার গায়ে পড়ে সে উঠে যায়। সবাই উঠে যাবার পর যে জন অবশিষ্ট থাকে সে "চোর" নির্বাচিত হয়।

লোকক্রীড়ার শ্রেণীবিভাগ ঃ

সারা বাংলায় অসংখ্য লোকক্রীড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যেগুলি বৈচিত্র্যে ভরা। এই লোকক্রীড়াগুলিকে নানা দিক থেকে বিভাজন করা সম্ভব। কিন্তু পূর্ববর্তী কোন আলোচক এই বিভাজন করতে তেমন ভাবে সচেষ্ট হননি। কিছু কিছু আলোচক লোকক্রীড়া গুলির শ্রেণী বিন্যাস করেছেন, কিন্তু সমস্ত লোকক্রীড়াকে সঠিকভাবে বর্গীকরণ করতে পারেননি। সঠিকভাবে বর্গীকরণ করতে পারলে লোকক্রীড়াগুলির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, অনুশীলন পদ্ধতি, স্থান, ধর্ম প্রভৃতি অনুধাবন করা সহজ হবে। ড. ওয়াকিল আহমেদ সর্বপ্রথম লোকক্রীড়ার শ্রেণীবিভাগ করতে সচেষ্ট হন। তিনি লোকক্রীড়াগুলিকে ৫টি ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করেন, যথা — শ্রমসাপেক্ষ শরীরচর্চার খেলা, শ্রমহীন আমোদের খেলা, পানির খেলা, ছড়া ও ধাঁধার খেলা ও আনুষ্ঠানিক খেলা। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগে সমস্ত লোকক্রীড়াকে একজায়গায় আনা যায় না। এই শ্রেণীবিভাগের বাইরেও কিছু লোকক্রীড়া থেকে যায় যেগুলির প্রতি তিনি আলোকপাত করেন নি। যেমন অংশগ্রহণকারী কারা? পুরুষ, মহিলা না উভয়ই? দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র পানির খেলার শ্রেণী বিভাগ করেছেন। স্থলের বা গাছের খেলার উল্লেখ নেই। তৃতীয়তঃ খেলাগুলির খেলোয়াড় সংখ্যার প্রতি আলোকপাত করেন নি। চতুর্থতঃ লোকক্রীড়াগুলি উপকরণযুক্ত না উপকরণ বিহীন সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেননি। স্বভাবতঃই এই শ্রেণীবিন্যাসকে সম্পূর্ণ বলা যায় না।

অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী প্রায় সমস্ত লোকক্রীড়াকেই তাঁর শ্রেণীবিভাগের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছেন। তথাপি কিছু লোকক্রীড়াকে সেই শ্রেণীবিন্যাসেও আনা হয়নি। যেমন কিছু লোকক্রীড়া আছে যেগুলি শুধুমাত্র জলের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, আবার কিছু লোকক্রীড়া শুধুমাত্র গাছে. তিনি এই বিষয়টি তাঁর শ্রেণীবিভাগে তুলে ধরেননি। দ্বিতীয়তঃ কিছু লোকক্রীড়া আছে যেগুলি প্রচুর শ্রমসাপেক্ষ আবার কিছু লোকক্রীড়া আছে যেগুলি শ্রমহীন আমোদের। তৃতীয়তঃ অভিনয় ধর্মী ও উৎসব কেন্দ্রিক কিছু লোকক্রীড়া রয়েছে যেগুলির প্রতিও তিনি আলোকপাত করেননি।

গবেষক সুব্রত মুখোপাধ্যায় লোকক্রীড়ার যে শ্রেণী বিভাগ করেছেন তা অনেকাংশে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। কারণ তিনি পুরুষ, মহিলা, ও উভয়ে খেলে এমন লোকক্রীড়ার শ্রেণী বিভাগ করেছেন। লোকক্রীড়া গুলিকে তিনি ২টি ভাগে বিভক্ত করেছেন — বসে খেলা ও না বসে খেলা। আবার পুরুষদের লোকক্রীড়াগুলিকে তিনি ২টি ভাগে ভাগ করেছেন — বসে খেলা পুরুষদের খেলা ও না বসে খেলা পুরুষদের খেলা। মহিলা বা উভয়ে খেলে এমন বসে বা না বসে খেলার প্রতি তিনি আলোকপাত করেন নি। দ্বিতীয়তঃ না বসে খেলাকে তিনি ২টি ভাগে ভাগ করেছেন — প্রতিযোগিতামূলক ও বিনোদনমূলক। প্রতিযোগিতামূলক ও বিনোদনমূলক বসে খেলার তিনি শ্রেণী বিন্যাস করেননি। স্বভাবতঃই এই শ্রেণী বিন্যাসকে আংশিক শ্রেণীবিন্যাস বলা চলে, সম্পূর্ণ নয়।

উপরোক্ত বিশেষজ্ঞ আলোচকদের শ্রেণী বিভাগের সারমর্ম অনুধাবন করে এই পুস্তকে লোকক্রীড়ার একটি শ্রেণী বিন্যাস করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত লোকক্রীড়াগুলি এই শ্রেণীবিভাগে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। প্রাপ্ত লোকক্রীড়াগুলির বৈশিষ্ট্য, স্থান-ধর্ম, অনুশীলন পদ্ধতি ও খেলার বিষয়গুণ অনুধবান করে

নিম্নোক্ত ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা হল

লোকক্রীড়ার শ্রেণীবিভাগ

লোকক্রীড়া

ভেদ	শ্রেণী	উপশ্রেণী	উদাহরণ
লিঙ্গ ভেদে	ছেলেদের		ডাংগুলি, লাঠি পোতাপুতি, গুটি খেলা, গাচ্ছুয়া-গাচ্ছুয়া ইত্যাদি
	মেয়েদের		রাজার মেয়ে ডিস্কোনাচ, চাঁদামারী চৈ চৈ, ডাব্বা-ডাব্বা ইত্যাদি
	উভয়		লুকোচুরি, ডালিম ডালা, রুমাল চুরি, সাততালি ইত্যাদি
স্থান ভেদে	জল		হউড়ি, নলছিটি, হোলডুগ, আবুর মার টাবুর টুবুর ইত্যাদি
	স্থল	গাছের	ডোল খেলা, আমপাতা, আবদুল খেলা, গাছবাগড়ী ইত্যাদি
		ডাঙ্গার — ঘরের ভেতরের	ভাত ভাত খেলা, রসকষ, চোর পুলিশ, রান্না-বান্না খেলা ইত্যাদি
		ডাঙ্গার — ঘরের বাইরের	জোড় বাঁধাবাঁধি, লাল লাঠি, পাতা আনা ইত্যাদি
সংখ্যা ভেদে	দলগত		দই-খই-চিঁড়ে-মুড়ি, এলাগু লণ্ডন, ইঁদুর বিড়াল ইত্যাদি
	দলগত নয়		ব্যাঙের মাথা, লাঠি টানাটানি, ষোল ঘুঁটি ইত্যাদি
উপকরণ ভেদে	উপকরণ যুক্ত		ভাত ভাত খেলা, পিট্টু, ব্যাঙ লাফানো, রশি টানাটানি ইত্যাদি
	উপকরণ বিহীন		শী-বুড়ি, আইসক্রীম, চোর চোর, বুড়ো-বুড়ি ইত্যাদি
আচার ভেদে	উৎসব কেন্দ্রিক	ধর্মীয়	কগড়ী, চেংগি ডাণ্ডি, দধিকাদ, চামড়ী ইত্যাদি
		সামাজিক	বর কনের জুয়া খেলা, কড়ি খেলা, হাঁড়ি খেলা ইত্যাদি
	উৎসব কেন্দ্রিক নয়		পাতা আনা, ইচিং বিচিং, খুদিমুদি ইত্যাদি।
মহড়া ভেদে	অভিনয় ধর্মী		এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা, কুমির কুমির, কুকুর ও শকুনি ইত্যাদি
	ছড়া ধর্মী		ইকিড় মিকিড়, উপেনটি বাইস্কোপ, এলাটিং বেলাটিং ইত্যাদি
শরীরচর্চা ভেদে	শ্রম সাপেক্ষ		বউছি, গাদি, বাগড়ী, গোল্লাছুট ইত্যাদি
	শ্রম হীন		আগডুম-বাগডুম, রসকস, ষোল ঘুঁটি ইত্যাদি

শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী লোকক্রীড়াগুলি লিপিবদ্ধ করণ ও বিশ্লেষণ ঃ

ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত লোকক্রীড়াগুলির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে বর্তমান গ্রন্থে ৭টি শ্রেণীতে লোকক্রীড়াগুলিকে বিভক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত লোকক্রীড়াকেই এই ৭টি শ্রেণী বিভাগের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। লিঙ্গ ভেদে শ্রেণী বিভাগের মূল উদ্দেশ্য খেলাটি কাদের? ছেলেদের না মেয়েদের, না ছেলে ও মেয়েদের? স্বভাবতঃই এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে ছেলে, মেয়ে ও উভয়ই খেলে এমন লোকক্রীড়াগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ স্থান ভেদে একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্য খেলাটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? ঘরের ভেতরে, ঘরের বাইরে, গাছে, জলে ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ সংখ্যা ভেদে একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে দলগত এবং দলগত নয় এমন লোকক্রীড়াগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। '৩' সংখ্যার অধিক খেলোয়াড় যুক্ত খেলাগুলিকে দলগত এবং '৩' সংখ্যার কম খেলোয়াড় যুক্ত খেলাগুলিকে দলগত নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থতঃ উপকরণ ভেদে একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। আমরা জানি বেশীর ভাগ লোকক্রীড়াই উপকরণ বিহীন তথাপি কিছু কিছু লোকক্রীড়ায় উপকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। যদিও সেগুলি একান্তভাবে দেশীয়, সুলভ ও প্রকৃতি প্রদত্ত। স্বভাবতঃই উপকরণ যুক্ত ও উপকরণ বিহীন। খেলাগুলিকে এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চমতঃ আচার ভেদে একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে এমন অনেক লোকক্রীড়ার সন্ধান মিলেছে যেগুলি শুধুমাত্র আচার বা উৎসব কেন্দ্রিক। এই উৎসব ধর্মীয় ও সামাজিক উভয়বিধ। এই দুই প্রকার উৎসবকে কেন্দ্র করেই এই লোকক্রীড়াগুলি একমাত্র সংগঠিত হয়। ফলতঃ আচার ভেদে একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। ষষ্ঠতঃ মহড়া ভেদে একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। যে শ্রেণী বিভাগের মধ্যে অভিনয় ধর্মী ও ছড়াধর্মী লোকক্রীড়াগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। ছড়া বলার ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ক্রীড়ার অভিনয়ধর্মী গুণ অনুধাবন করে এই শ্রেণী বিভাগটি করা হয়েছে। সব শেষে দেহচর্চা ভেদে একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণী বিভাগে প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন এমন লোকক্রীড়াগুলিকে শ্রমসাপেক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত কম বা একেবারেই পরিশ্রম করতে হয় না এমন লোকক্রীড়াগুলিকে শ্রমহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিঙ্গ ভেদে ঃ—

লিঙ্গভেদে মানুষ দু-প্রকার—পুরুষ ও মহিলা। শারীরবৃত্তিয় ভাবে এদের কর্মক্ষমতাও আলাদা। পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী পরিশ্রমী। খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শিষ্টক্রীড়ায় এই পার্থক্য তুলনামূলভাবে কম। অপেক্ষাকৃত বেশী পরিশ্রমযুক্ত খেলাগুলিতে পুরুষরা অংশগ্রহণ করে থাকে। অনুরূপভাবে অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমযুক্ত খেলাগুলিতে মহিলারা অংশগ্রহণ করে। আবার ততোধিক পরিশ্রম যুক্ত নয় বা একেবারেই পরিশ্রম নেই এমন খেলাগুলিতে পুরুষ ও মহিলারা একত্রে অংশগ্রহণ করে। স্বাভাবিক ভাবেই লিঙ্গ ভেদে শ্রেণী বিভাগটিতে পুরুষ বা ছেলেদের, মহিলা বা মেয়েদের এবং ছেলে ও মেয়ে একত্রে খেলে এমন খেলাগুলিকে এই শ্রেণী বিভাগে আনা

হয়েছে। নিম্নে শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী ছেলেদের, মেয়েদের ও উভয়ই খেলে এমন লোকক্রীড়া গুলিকে তুলে ধরা হল—

ছেলেদের খেলা ঃ

(ক) খেলার নাম	ঃ	**লাঠি পোঁতাপুতি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালক
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৪-৫জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	দুই ফুট মাপের একটি করে লাঠি (এক প্রান্তে সূচাল)
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	দক্ষিণদিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলা
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	ডাং পোঁতাপুতি, গুজি খেলা, গইচ্যা খেলা, গাইগোদানি ইত্যাদি।

খেলার পদ্ধতি ঃ

সাধারণতঃ গ্রামের রাখাল বালকেরা এই খেলাটি খেলে। ভেজা এঁটেল মাটি বা পুকুরে জল শুকিয়ে গেলে গভীর কাদা যুক্ত জায়গা এই খেলার উপযুক্ত স্থান। যতজন খুশী এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। খেলোয়াড়দের সবার হাতে একপ্রান্ত সূচাল যুক্ত একটি শক্ত লাঠি থাকে, যা রাখালরা গরু চরানোর কাজেও ব্যবহার করে। লটারীর মাধ্যমে খেলোয়াড়দের খেলায় অংশগ্রহণের পর্যায়ক্রম প্রস্তুত হয়। প্রথম জন নিজের লাঠিটি উপর থেকে ছুঁড়ে মাটিতে পুঁতবে। যত শক্ত ও সোজা হয়ে লাঠিটি পুঁতবে খেলোয়াড়ের পরাজয়ের সম্ভাবনা তত কম। এবার দ্বিতীয় বালক নিজ লাঠি দিয়ে জোরে আঘাত করে প্রথম বালকের লাঠি মাটিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে বা নিজের লাঠিটি প্রথম বালকের লাঠির গা ছুঁয়ে রাখার চেষ্টা করে। যদি সফল না হয় সে ক্ষেত্রে প্রথম বালক তার লাঠিটি তুলে দ্বিতীয় বালকের অনুরূপ চেষ্টা করে। সফল হলে তৃতীয় বালকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। এ ভাবে শেষ খেলোয়াড় পর্যন্ত খেলা চলতে থাকে। সবাইকে একে একে পরাজিত করে যে খেলোয়াড় সমস্ত লাঠি নিজের দখলে আনতে পারে সে-ই জয়ী হয়। বিজয়ী খেলোয়াড় এবার নিজের লাঠিটি রেখে অন্য খেলোয়াড়দের লাঠিগুলি যতদূর সম্ভব ছুঁড়ে দেয় এবং খেলোয়াড়রা লাঠি আনতে যাওয়ার অবসরে নিজের লাঠিটি লুকিয়ে ফেলে। খেলোয়াড়রা বিজয়ী খেলোয়াড়ের লাঠিটি খুঁজে বের করে এবং নিজের লাঠিটি বিজয়ী খেলোয়াড়ের লাঠির কাছে রেখে আসে। যে সব শেষে বিজয়ী খেলোয়াড়ের লাঠির সন্ধান পায় তাকে সমস্ত লাঠিগুলি বয়ে আনতে হয় এবং পরবর্তী খেলায় তাকে প্রথমে লাঠি মাটিতে পুঁততে হয়। এভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ খেলাটি পেশীশক্তি বিশেষ করে হাতের পেশী শক্তির উপর নির্ভরশীল।

লাঠিটি উপর থেকে ছুঁড়ে মাটিতে পোঁতার সময় হাতের সর্বাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। লাঠিটি শক্ত ও সোজা করে পুঁততে পারলে এই খেলায় পরাজয়ের সম্ভাবনা কম। অন্যের লাঠিটি নিজের লাঠি দিয়ে আঘাত করার সময় এবং বিজয়ী খেলোয়াড়দের দূরে লাঠি নিক্ষেপের মধ্যেও এই পেশী শক্তির ব্যবহার চোখে পড়ে। তাছাড়া নিজের লাঠি দিয়ে অন্যের লাঠিকে মাটিতে ফেলার ক্ষেত্রে ঠিক কোন জায়গায় লাঠিটি পুঁততে হবে সেই অনুমান ক্ষমতাও এই খেলার একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

সংযোজন ঃ ড. ওয়াকিল আহমেদ খেলাটি প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বলাবাহুল্য, হাতের শক্তির উপর খেলার জয় পরাজয় নির্ভর করে। শক্তি প্রয়োগে এবং দৌড়াদৌড়িতে ব্যায়ামের উপকারিতা পাওয়া যায়। খেলার পদ্ধতিতে জুয়ার ধর্ম আছে।"[১]

সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন — "এই লোকক্রীড়াটিতে ভূমি দখলের মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে। ছুঁচালো লাঠি পুঁতে খেলুড়ে তার ভূমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু পরক্ষণে অপর খেলুড়ে তার লাঠি পুঁতে প্রথমজনের অধিকার নস্যাৎ করার চেষ্টা করতে থাকে। ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার পর ভূমি নিয়ে সংঘাতের চালচিত্র খেলাটিতে পড়ে থাকতে পারে।"[২]

(খ) খেলার নাম	ঃ	ডাংগুলি
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১৫-১৮ বছরের বালক
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৪-৫ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	একটি শক্ত লাঠি ও একটি শক্ত কাঠি
খেলার সময়	ঃ	দুপুর ও বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায়
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	ডাণ্ডা কুণ্ডি, গুলবাড়ি, ফুণ্ডিবাড়ি, রিংডাণ্ডা, গুলিডাণ্ডা ইত্যাদি।

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি বাংলার একটি অতি জনপ্রিয় খেলা। খেলা শুরুর আগে ছোট একটি লম্বা ধরনের গর্ত তৈরী করে নিতে হয়। খেলায় লাগে একহাত পরিমাণ একটি শক্ত লাঠি যা 'ডাং' এবং ৪-৫ ইঞ্চি মাপের লম্বা একটি কাঠি যা, 'গুলি' নামে পরিচিত। এই দুয়ে মিলে 'ডাংগুলি'। এই খেলায় খেলোয়াড় সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। একজন খেলোয়াড় লম্বা ধরনের গর্ত থেকে গুলিটিকে ডাং দিয়ে খোঁচা মেরে তোলে। খোঁচা মারার পর গুলিটি যে উচ্চতায় ওঠে সেই উচ্চতায় ডাং দিয়ে প্রচণ্ড জোরে গুলিটিকে আবার আঘাত করে। এই সময় বাকি খেলোয়াড়রা গর্তটি ঘিরে বেশ কিছুটা দূরত্বে দাঁড়ায়। এই আঘাত করার পর গুলিটি যদি কোন খেলোয়াড় মাটিতে পড়ার আগে ধরতে পারে তবে ডাংধারী দান ছেড়ে দেয়। কিন্তু যদি ধরতে না পারে সে ক্ষেত্রে দূরে পাঠানো গুলিটি গর্ত থেকে কত দূরে গেল তা ডাং দিয়ে মেপে দেখে। এই মাপের ফলে যার দূরত্ব সবথেকে বেশী সেই জয়ী হয়। এই

খেলাটিতে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ধরনের মাপের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় —

দক্ষিণ দিনাজপুর — এরি, দুড়ি, থেড়ি, চাউল, চম্পা, ঝিমকা, কন্না।

বর্ধমানে — এনা, দোনা, তেনা, চারা, মাচা, ছই, ঘই।

বীরভূমে — বারি, দুরি, তেরি, চাল, চম্পা, ঢেক, লঙ্কা।

হুগলীতে — এড়ি, দোড়ি, তিলুয়া, চৌড়ি, চম্পা, জিবুক, লঙ্কা।

মেদিনীপুর — ডাণ্ডা, কড়িয়া, ধানি, সরিষা, পোস্ত, বালি, জল।

মুর্শিদাবাদ — মোনা, দোনা, তেনা, চারা, পাঁচা, ছই, গই।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি হাতের পেশীশক্তি, হাত ও চোখের সমন্বয়, অনুমান শক্তি ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া নির্ভর। 'ডাং' দিয়ে 'গুলি' টিকে জোরে আঘাত করে দূরে পাঠানোর ক্ষেত্রে হাতের পেশীশক্তির বিশেষ প্রয়োজন। ডাং দিয়ে গুলিটি গর্ত থেকে তোলার ক্ষেত্রে হাত ও চোখের সমন্বয়ও প্রয়োজন। তাছাড়া ডাং দিয়ে গুলিটিকে আঘাত করার সময় ঠিক কোন জায়গায় আঘাত করলে গুলিটি অনেক দূরে যাবে সেই অনুমান ক্ষমতা এবং ডাং দিয়ে গুলিটি মারার পর বিপক্ষ খেলোয়াড়দের গুলিটি ধরার প্রতিবর্ত ক্রিয়াও এই খেলায় উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ে।

সংযোজন ঃ এই খেলাটি প্রসঙ্গে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ড. ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন, "ক্রিকেট খেলার সাথে ডাংগুলি খেলার একটি মিল দেখা যায়। ক্রিকেটে বোলারের চেয়ে ব্যাটস্‌ম্যানের দায়-দায়িত্ব বেশী। ডাংগুলি খেলায় ডাণ্ডাধারীরও দায়িত্ব অধিক। ব্যাট ও বল ডাণ্ডা ও গুলির সমতুল। পিচ আর গর্ত প্রায় অভিন্ন। ব্যাটস্‌ম্যান নানা ভাবে আউট হতে পারে। ডাংগুলিতেও আউট করার নানা পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। বলা যায় এটি ক্রিকেট খেলার গ্রাম্য সংস্করণ।"[২]

ড. পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন, "জমি দখল, কৃষি কর্মের বিলি ব্যবস্থা এবং শিকার করা ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপার লুকিয়ে আছে 'ডাংগুলি' খেলার মধ্যে।"[৩]

ড. অসীম দাস খেলাটি প্রসঙ্গে বলেছেন, "মাটিতে খোঁড়া গর্তটি নারী যোনীর প্রতীক ছাড়া অন্য কিছু নয়। খেলোয়াড় নিজের গুলিটিকে ঐ গর্তের মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করার অর্থ হল নারীযোনিতে বীজ স্থাপন করার চেষ্টা চালানো। তার ফলেই ফসল উৎপাদন সম্ভব।"[৪]

অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন - "ডাংগুলি খেলায় যে ডাং লাগে সেটি হল আদিম পদ্ধতিতে অনুসৃত কৃষি কার্যে ব্যবহৃত যে খনন যষ্টি তারই প্রতীক। তাছাড়া ডাংটি পুরুষাঙ্গেরও প্রতীক। 'গুলি'টি মাটি থেকে সংগৃহীত 'আহারযোগ্য কন্দ'। যে গর্ত করে ডাংগুলি খেলা হয় সেটি হল স্ত্রী জননাঙ্গের প্রতিরূপ। আবার কেউ কেউ ডাংটিকে শিশুর পিতা এবং গুলিটিকে সদ্যোজাত সন্তানের প্রতীক বলে মনে করেছেন।"[৫]

(গ) খেলার নাম ঃ গুটি খেলা

সাধারণভাবে অংশ গ্রহণকারী ঃ ১০-১৫ বছরের বালক

সংখ্যা	ঃ	নির্দিষ্ট নয়, দুই বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	একটি করে গুটি বা মার্বেল
খেলার সময়	ঃ	দিনের যে কোন সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায়
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	মার্বেল খেলা, ভেটা খেলা, আলিগুটি, বেগত খেলা।

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি ছেলেদের খেলা। খেলোয়াড়রা প্রত্যেকে একটি করে গুটি বা মার্বেল হাতে নেয়। খেলা শুরুর আগে একটি ছোট গর্ত তৈরী করা হয়। এবার খেলোয়াড়রা সবাই গর্ত থেকে বেশ কিছু দূরে একটি নির্দিষ্ট দাগে দাঁড়ায়। দাগ থেকে গর্ত অভিমুখে সবাই নিজের হাতের গুটিটিকে ছুঁড়ে দেয়। যার গুটি গর্তের সব থেকে কাছে থাকে সে সবার আগে মারার সুযোগ পায়। সবার আগে যারা ১০ পর্যন্ত করতে পারে তারা জয়ী হয়। এভাবে শেষ পর্যন্ত একজন অবশিষ্ট থাকে, যে দশ করতে পারেনা। এই দশ সংখ্যা করার নিয়ম হল গর্তে ফেলতে পারলে এক এবং অন্যের গুটিতে নিজের গুটি মেরে লাগাতে পারলে 'এক'। এ ভাবে যারা গর্তে ফেলে এবং গুটিতে লাগিয়ে ১০ করতে পারে তারা সবাই জয়ী হয়। একজন অবশিষ্ট থাকে যে ১০ করতে পারে না সে 'গাই' নির্বাচিত হয়। 'গাই' এর গুটিকে এবার অন্যান্য বিজয়ী খেলোয়াড়গণ গর্ত থেকে নিজেদের গুটি দিয়ে আঘাত করে। আঘাত করার সময় নিম্নোক্ত কথাগুলি উচ্চারণ করে —

একে এন্দুর / দুইয়ে দাঁত,
তিনে তেলি / চারে চোর,
পাঁচে পেচা / ছয়ে ছোঁচা,
সাতে শালিক / আটে দাদার পা চাটে
নয়ে নাপিত / দশে ধোপা,
এগারোয় এঁড়ে বাছুর / বারোয় বকনা বাছুর,
তেরয় তেন্দর বান্দর / চৌদ্দয় চাদর
পনেরয় সম্বন্ধ / ষোলয় পাক্লা দেখা,
সতেরয় আশীর্বাদ / আঠেরোয় বিয়ে,
উনিশে বৌভাত / বিশে এক ছেলের বাপ,
একুশে ছেলের মুখে ভাত / বাইশে এক ছেলে এক মেয়ের বাপ,
তেইশে মেয়ের মুখে ভাত / চব্বিশে মেয়ের সম্বন্ধ
পঁচিশে মেয়ের বিয়ে / ছাব্বিশে মেয়ের বাসি বিয়ে,
সাতাশে ছেলের নাতি / আটাশে মেয়ের নাতি। ... ইত্যাদি।
(উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় প্রচলিত ছড়া)

এভাবে খেলাটি চলতে থাকে যতক্ষণ না গাই নিজের গুটিটি গর্তে ফেলতে পারছে। গর্তে ফেলতে পারলে আবার নতুন করে খেলা শুরু হয়।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি আঙ্গুলের শক্তি, অনুমান ক্ষমতা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Target) নির্ভর। গুটি বা মার্বেল দিয়ে অন্যের গুটিকে আঘাত করে জোরে পাঠানোর ক্ষেত্রে আঙ্গুলের শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। অন্যের গুটিকে ঠিক জায়গায় আঘাত করার ক্ষেত্রে বা নিজের গুটিটি দূর থেকে গর্তে ফেলার ক্ষেত্রে অনুমান ক্ষমতা ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যেরও বিশেষ প্রয়োজন হয় এই খেলায়। তাছাড়াও 'গাই' এর গুটিকে আঘাত করার সময় যে শব্দগুলি উচ্চারণ করা হয় সেখানে গণনা শিক্ষা ভীষণভাবে চোখে পড়ে।

ড. অসীম দাস তাঁর "বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস" গ্রন্থে এই খেলা প্রসঙ্গে বলেছেন — খেলাটিতে ফসল ও সন্তান উৎপাদনের সমার্থকতার অভিপ্রায়টি লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছড়ায় ব্যবহৃত শব্দগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন —

"এই ছড়ায় 'দশে ধোপা' পর্যন্ত অংশে দেখা যাচ্ছে বিজিতের প্রতি বিজেতার কটূক্তি। সমাজে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকে যে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হত সে কথাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু 'এগারোয় এঁড়ে বাছুর / বারোয় বকনা বাছুর' অংশ থেকেই বিবাহ এবং বিভিন্ন প্রজন্মের সন্তান উৎপাদনের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'এঁড়ে বাছুর' বলতে অবিবাহিত কুমারকে এবং 'বকনা বাছুর' বলতে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। তারপরই 'সম্বন্ধ' 'পাকা দেখা' 'আশীর্বাদ' 'বৌভাত' পর্যন্ত বিবাহ সংক্রান্ত আনুপূর্বিক সমস্ত স্তরগুলি অতিক্রম করার পরই 'বিশে এক ছেলের বাপ' হওয়া সম্ভব হয়েছে। পরে ছেলের ও মেয়ের 'মুখে ভাত' দিয়েই ছড়া শেষ হচ্ছে না একেবারে তৃতীয় প্রজন্ম এমনকি চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে 'আটাশে মেয়ের নাতি'র উল্লেখের মধ্য দিয়ে। সেই কারণেই বলেছি গর্তে গুলি ফেলে বিজয়লাভ করার সঙ্গে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের সন্তান উৎপাদন তথা চিরদিনের সুফসলের আকাঙ্ক্ষাটি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। সন্তান উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতপক্ষে ফসল উৎপাদনাকাঙ্ক্ষারই প্রতিকল্প।"[৪]

(গ) খেলার নাম	ঃ	**গাচ্ছুয়া-গাচ্ছুয়া**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালক
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৪-৫ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	একটি লাঠি
খেলার সময়	ঃ	দুপুর বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	উত্তর ও দক্ষিন ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলা
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	সোল-ঝাপটা, ডগারে-ডগা

খেলার পদ্ধতি ঃ

দুপুরবেলা রাখাল বালকেরা সাধারণতঃ এই খেলা খেলে। উপকরণ হিসাবে একখানি লাঠি ব্যবহৃত হয়। কোন বাগানবাড়ী খেলার উপযুক্ত স্থান। দলের একজনকে চোর করা হয়। সে এক পা দিয়ে লাঠিটি স্পর্শ করে দাঁড়ায়। বাকিরা সবাই গাছের উপর থেকে তাকে স্থানচ্যুত করার জন্য প্রলোভন দেখায়। চোর চেষ্টা করে যে কোন একজনকে ছুঁয়ে এসে

(খ) খেলার নাম	ঃ	**চাঁদমারী চেঁ চেঁ**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১২ বছরের বালিকা
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৭-৮ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী, বর্ধমান সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	দুধে ভাতে, সিঁদুর টোকাটুকি, খই-দই-গুড়-চাখ, গোবর গুলে ভাত খাই, আম কাঁঠাল ইত্যাদি।

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলায় দুটি দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে খেলা শুরু হয়। প্রায় ৩০-৩৫ ফুট ফাঁকা জায়গায় দু দিকে দুটি লম্বা লাইন (দাগ) টানতে হয়। দুপক্ষের খেলোয়াড়রা দুটি লাইনের পেছনে বসে। দুপক্ষেরই দুজন দলনেতা থাকে। দলনেতারা নিজ নিজ দলের খেলোয়াড়দের একটি করে নির্দিষ্ট নাম রাখে। বিরোধীপক্ষ কোন ভাবেই যেন তা জানতে না পারে। নামগুলো সাধারণতঃ ফুল, ফল, মাছ, পাখী ইত্যাদির নামে হয়। এবার একপক্ষের দলনেতা অপর পক্ষের যে কোন একজনের চোখ হাত দিয়ে খুব শক্ত করে ধরে, যাতে সে একটুও দেখতে না পায় এবং চোখ ধরে দলনেতা নিজ দলের যে কোন একজনকে তার দেওয়া নাম অনুসারে ডাকে, যেমন - 'আয়রে মোর টিয়া'। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে যার নাম টিয়া সে খুব আস্তে আস্তে যার চোখ ধরেছে তার কাছে এসে কপালে একটি টোকা দেয় এবং নিজ দলে ফিরে যায়। ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে 'চাঁদমারী চেঁ চেঁ' বলে আওয়াজ করে। এবার যাকে টোকা মেরেছে সে বিরোধী পক্ষের সবাইকে দেখে এবং যে টোকা মেরেছে তার নাম বলার চেষ্টা করে। যদি ঠিক বলতে পারে তবে সে তার জায়গা থেকে জোড় পায়ে সামনের দিকে একলাফ মারে। আর যদি না বলতে পারে তবে যে টোকা মেরেছে সে সামনের দিকে একলাফ দেয়। এভাবে যারা আগে লাফ দিয়ে বিপক্ষের লাইন পার হতে পারে তারা জয়ী হয়। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি অনুমান ক্ষমতা ও পায়ের পেশীশক্তি নির্ভর। এই খেলা একপক্ষের দলনেতা অন্য পক্ষের যে কোন একজন খেলোয়াড়ের চোখ হাত দিয়ে খুব শক্ত করে ধরে, যাতে দেখতে না পায়। হাত দিয়ে ধরার পর নিজ পক্ষের যে কোন একজন খেলোয়াড় এসে যার চোখ ধরেছে তার কপালে টোকা মারে। যাকে টোকা মেরেছে সে টোকা মারা ব্যক্তির নাম বলতে পারলে তার জায়গা থেকে জোড় পায়ে সামনের দিকে এক লাফ দেয়। এই লাফানোর ক্ষেত্রে পায়ের পেশী শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। 'স্ট্যান্ডিং ব্রডজাম্প' নামক প্রচলিত পায়ের পেশী শক্তির অভীক্ষার সঙ্গে এই খেলাটির সাযুজ্য রয়েছে।

(গ) খেলার নাম ঃ **ডাব্বা-ডাব্বা**

(গ) খেলার নাম	ঃ	**ডাব্বা-ডাব্বা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১২ বছরের বালিকা
সংখ্যা	ঃ	নির্দিষ্ট, ৫ জন
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

চোর নির্বাচনের যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে একজনকে চোর নির্বাচন করা হয়। খেলার শুরুতে একটি আয়তক্ষেত্রকে চারটি সমান ঘরে বিভক্ত করা হয়। এই আয়তক্ষেত্রের চারটি ঘরে চার জন খেলোয়াড় এবং মাঝখানে চোর দাঁড়ায়। যে কোন একজন খেলোয়াড় প্রথমে এক পা তুলে ডাব্বা ডাব্বা বলতে বলতে বাকি খেলোয়াড়দের ঘরের ধার ঘেষে চলতে শুরু করে। দম থাকা অবস্থায় সমস্ত ঘর ঘুরে নিজের ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করে। যদি মাঝপথে দম ফুরিয়ে যায় তবে যে কোন ঘরে দাঁড়াতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বাকি খেলোয়াড়রাও সমস্ত ঘর পরিক্রমা করে। দম ফুরিয়ে যাওয়া অবস্থায় অথবা পা মাটিতে পড়ে যাওয়া অবস্থায় চোর যদি কাউকে ছুঁয়ে দেয় তাহলে সে চোর হয়। এই ভাবে ছড়া বলতে বলতে চারজনই ঘরের চারপাশে ঘুরতে থাকে। নিম্নোক্ত কথাগুলি ছড়ার মাধ্যমে উচ্চারণ করে —

১। ডাব্বা-ডাব্বা
২। কালাইচি-কালাইডুম
৩। জাল ফেলেছি মাছ ধরেছি।
৪। নেচেছি নেচেছি ঘুর ঘুরিয়ে নেচেছি।
৫। ভাঙা থালায় পয়সা দিলাম (চোরের নাম করে) — বিয়ে ঠিক করলাম।
৬। শুক্লার (চোরের নাম) বর এসেছে লাল মিষ্টি এনেছে।
৭। বাটিতে আমছুলি হাত পা কেটে মরি।

উপরের প্রতিটি লাইন এক একবার করে বলতে বলতে খেলোয়াড়দের ঘরের চারিদিকে ঘুরতে হয়, নিম্নোক্ত অভিনয়ের মাধ্যমে।

১। এক পা তুলে হাতে তালি দিতে দিতে নাচের মাধ্যমে পরিভ্রমণ করবে।
২। ঐ
৩। ঐ
৪। এক পা তুলে যে যার ঘরের সামনে ঘুরে ঘুরে নাচ করে পরিভ্রমণ করবে।
৫। ১,২,৩ এর মত
৬। ঐ
৭। ঐ

এবারে যে চারজন কোর্টের মধ্যে ছিল তারা দুব্বা এনে (দলবেঁধে) চোরের মাথায়

দিয়েই ছুটে পালিয়ে যায়। এই সময় চোর যদি কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে যাকে ছুঁয়েছে সে তখন চোর হয়। আবার প্রথম থেকে অর্থাৎ ডাব্বা ডাব্বা থেকে খেলা শুরু হয়।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি গতি, ভারসাম্য ও দম নির্ভর। মুখে 'ডাব্বা-ডাব্বা' উচ্চারণ করতে করতে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার সময় দম এবং এক পা এর সাহায্যে ঘরগুলি পরিক্রমা করার ক্ষেত্রে ভারসাম্যের বিশেষ প্রয়োজন। দুব্বোঘাস এনে চোরের মাথায় দিয়ে ছুটে পালানোর সময় গতির সর্বাধিক প্রয়োজন লক্ষ্য করা যায়। স্বভাবতঃই গতি বা দ্রুত দৌড়ানোর ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের সার্বিক সক্ষমতাও চোখে পড়ে। তাছাড়া অতিথি এলে মিষ্টি আনার বিষয়টি বা অতিথি আপ্যায়নের বিষয়টি এ খেলার একটি অন্যতম শিক্ষামূলক দিক।

(ঘ) খেলার নাম	ঃ	**এক্কাদোক্কা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালিকা
সংখ্যা	ঃ	দুই বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	একটি ভাঙা হাঁড়ি বা কলসীর টুকরো
খেলার সময়	ঃ	সকাল ও বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও অন্যান্য জেলা
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	খাপচি, কিত কিত

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি পশ্চিমবঙ্গের বালিকাদের একটি জনপ্রিয় খেলা। দুজন অথবা দু-এর বেশী এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। খেলাটি পুরোপুরি ব্যক্তিগত। খেলা শুরুর আগে খেলার জন্য একটি 'কোর্ট' তৈরী করে নিতে হয়, যা ৫ বা ৬টি ঘরে বিভক্ত। একটি ঘরের নাম বিশ্রাম ঘর। খেলার উপকরণ হিসাবে ভাঙ্গা হাড়ি কলসির গোলাকার টুকরো ব্যবহৃত হয়, যা 'চাড়া', বা 'খোলা' নামে পরিচিত। খেলার শুরুতে ঘরের বাইরে থেকে খোলা ছুঁড়ে ফেলে এক পা তুলে এবং ভর দেওয়া পায়ের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে খোলাটি বিশ্রাম ঘর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। নিয়ে যাবার সময় 'কিৎ কিৎ' অথবা ঐ জাতীয় কিছু ছড়া উচ্চারণ করতে হয়। নির্দিষ্ট ঘরে খোলা ফেলতে না পারলে, দম ছাড়লে অথবা বিশ্রাম ঘরে ছাড়া অন্য ঘরে পা ফেললে খেলোয়াড় দান হারায়। প্রথম জন দান হারালে, দ্বিতীয় জন ... এই ভাবে খেলাটি চলতে থাকে। যে খেলোয়াড় সব ঘরে খোলা রেখে ফিরিয়ে আনতে পারে সে বিশ্রাম ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে, না দেখে পেছনে নির্দিষ্ট ঘরে খোলাটি ছুঁড়বে। নির্দিষ্ট ঘরে খোলাটি পড়লে খেলোয়াড় সেই ঘরের অধিকারী হয়। এই ভাবে যে বেশী ঘর অধিকার করতে পারে সেই জয়ী হয়। উল্লেখ্য বিশ্রাম ঘরে সব খেলোয়াড়ই দু পা ফেলতে পারে। যে খেলোয়াড় যে কটি ঘর অধিকার করেছে সেই খেলোয়াড় সেই কটি ঘরে দুপা ফেলতে পারে। অন্যান্য খেলোয়াড়দের অধিকার যুক্ত ঘরগুলি লাফ দিয়ে পেরোতে হয়। এই ভাবে বেশী সংখ্যক ঘর অধিকারের মধ্য দিয়েই খেলাটির জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি ভারসাম্য, দম, পায়ের পেশীশক্তি ও অনুমান ক্ষমতা নির্ভর। খোলাটিকে এক পা তুলে অন্য পা দিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও পায়ের পেশী শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া খোলা নিয়ে যাওয়ার সময় 'কিৎ কিৎ' বা ঐ জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে দম এবং ঘর না দেখে উল্টোদিক থেকে খোলা ছুঁড়ে ঘর অধিকার করার ক্ষেত্রে অনুমান ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ে।

সংযোজন ঃ আব্দুল হাই এই খেলাটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "The interest of the game (Ekka-Dokka) centres round winning of rooms. The game hints at the eternal craving of a woman to build up a house of her own and a feeling of satisfaction from the fulfilment of her desire as a mother-acraving hardly the characteristic of a man."[৬]

ড. ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন, "নারী নীড়াশ্রয়ী। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীই পুরুষদের ঘর বাঁধার প্রেরণা দিয়েছে। ঘর দখল এবং ঘর-কন্নায় নারীর ভূমিকা আজও সক্রিয়। সুতরাং এক্কা দোক্কায় প্রাচীন সংস্কারের ও অভ্যাসের পরিচয় থাকতে পারে।"[১]

ড. অসীম দাস বলেছেন, "বাংলা তথা পূর্ব ভারতের প্রচলিত প্রধান ভূমি ব্যবস্থার রূপটিই আভাসে-ইঙ্গীতে এক্কাদোক্কা লোকক্রীড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। বাংলা কৃষি ভিত্তিক দেশ। চাষের জমিই এখানে উৎপাদনের প্রধান উপকরণ। দেশের জনসংখ্যা যখন কম ছিল তখন ভূমি পরিমাণের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব বিরোধ কম ছিল। জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে চাষযোগ্য ভূমির চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সময়েই নিজভূমির সীমানা অতি সূক্ষ্মভাবে নির্ধারিত হতে থাকে। এক্কা-দোক্কার ঘরগুলি সেই সূক্ষ্ম বিভাজন রেখা দ্বারা বিভক্ত ভূমিপরিমানকেই সূচিত করে।"[৪]

উভয়ের খেলা ঃ

(ক) খেলার নাম	ঃ	**লুকোচুরি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালক-বালিকা
সংখ্যা	ঃ	নির্দিষ্ট নয়, ৫-৬ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	দিনের যে কোন সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ অন্যান্য সমস্ত জেলা
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	পলাপলি, টইলা, চোখপলানি, ধাপ্পামারি, হুস্-হুস্, পঞ্চাশ চোর ইত্যাদি।

খেলার পদ্ধতি ঃ

চোর নির্বাচনের যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে একজনকে 'চোর' নির্বাচন করা হয়।

এই খেলায় খেলোয়াড় সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। যতজন খুশী অংশগ্রহণ করতে পারে। খেলার আদর্শ স্থান কোন লোকালয়, খড়ের গাদা বা পরিত্যক্ত গৃহ। খেলা শুরু হয় চোর এর একটি নির্দিষ্ট বস্তু ছুঁয়ে আসার মধ্য দিয়ে। চোর নির্দিষ্ট বস্তু ছুঁয়ে আসার ফাঁকে সমস্ত খেলোয়াড় লুকিয়ে পড়ে। লুকিয়ে পড়ে খেলোয়াড়রা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে 'টইলা' বা 'টু-কি' বলে। এবার চোর এক এক করে সমস্ত খেলোয়াড়কে খুঁজে বের করে। যাকে প্রথম দেখে ফেলে তার উদ্দেশে নাম বলে 'এক' উচ্চারণ করে। অর্থাৎ রামকে প্রথম দেখতে পেলে বলবে 'রাম এক'। এই ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং শেষ খেলোয়াড় পর্যন্ত খুঁজে বের করার পালা চলে। কিন্তু খোঁজার ফাঁকে কোন খেলোয়াড় যদি চোরকে ছুঁয়ে দিতে পারে বা 'ধাপ্পা' দিতে পারে তাহলে চোর চোরই থাকে এবং আবার নতুন করে খোঁজা শুরু হয়। কিন্তু 'ধাপ্পা' বাঁচিয়ে সবাইকে চোর যদি খুঁজে বের করতে পারে তাহলে যাকে প্রথম খুঁজে বের করেছে সে চোর হয়। এই ভাবে খেলাটি অনির্দিষ্ট সময় কাল ধরে চলতে থকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ প্রখর অনুমান ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা ও প্রতিক্রিয়ার সময় নির্ভর। লুকিয়ে থাকা খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে এবং চোরের অবস্থান বোঝার ক্ষেত্রে প্রখর অনুমান ক্ষমতা বিশেষ প্রয়োজন। চোরকে ধাপ্পা দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতা ও প্রতিক্রিয়ার সময় উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ে।

সংযোজন ঃ সুব্রত মুখোপাধ্যায় খেলাটি প্রসঙ্গে বলেছেন, "আদিতে মানুষ ছিল সংগ্রাহক ও শিকারজীবী। বন্য ফলমূলাদি সংগ্রহ করে এবং পশুশিকার দ্বারা সে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করতো। লুকোচুরি খেলাটিতে ঐ আদিম জীবন যাত্রার প্রতিফলন ঘটেছে। লুক্কায়িত খেলুড়ীরা গভীর অরণ্যের প্রাণী আর চোর হলো শিকারী। লুকিয়ে থাকা খেলুড়ীদের দূর থেকে 'এক' বললে সে 'মরা'। এই 'দূর থেকে' ব্যাপারটি শিকারীর তীর বা বর্শা ছুঁড়ে শিকারকে আঘাত করার প্রতীকী অর্থ হতে পারে। খেলাটিতে নিয়মানুযায়ী চোর কোন লুক্কায়িত খেলুড়ি স্পর্শ করে সে পুনরায় 'চোর' হয় এবং গোড়া থেকে আবার খেলতে হয়। ব্যাপারটির মধ্যে নিহিত সত্য হলো কখনও কখনও শিকারীর অসর্তকতার সুযোগে বন্য হিংস্র পশু তার ওপর আক্রমণ করতে পারে। লোকক্রীড়াটি সারাভারতে বিভিন্ন নামে ও রূপে প্রচলিত। পশ্চিমদেশে খেলাটি 'Hide and Seek' নামে পরিচিত। একদা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরেও লুকোচুরি খেলার রীতি ছিল বলে জানা যায়।"[২]

(খ) খেলার নাম	ঃ	ডালিম ডালা
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১২ বছরের বালক-বালিকা
সংখ্যা	ঃ	নির্দিষ্ট নয়, ৬-৭ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	একটি রবারের বল
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা

খেলার পদ্ধতি ঃ

চোর নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে একজনকে চোর নির্বাচন করা হয়। ১২-১৫ ফুট ব্যবধানে দুটি গোলাকার ঘর তৈরী করা হয়। একঘরে চোর এবং অন্যঘরে বাকি খেলোয়াড়রা থাকে। চোর তার ঘর থেকে অন্য ঘরের কাছে গিয়ে এক এক জনকে লক্ষ্য করে বল ছুঁড়ে মারে। যার শরীরে বলটি স্পর্শ করে সে চোরের ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। খেলোয়াড়রা বলের স্পর্শ বাঁচাবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। সমস্ত খেলোয়াড়দের বল ছুঁড়ে এক এক করে আউট করার মধ্য দিয়ে খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য নির্দিষ্ট জনকেই বল ছুঁড়ে আউট করতে হয়। খেলাটিতে চোর ও বাকি খেলোয়াড়দের মধ্যে কথোপকথন লক্ষ্য করা যায়।

চোর	-	ডালিম ডালা
সমবেত খেলোয়াড়	-	কিসকো বোলা
চোর	-	মার মার
সমবেত	-	কাকে মার
চোর	-	সবাইকে ছেড়ে দিয়ে (যে কোন নাম) কে মার।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ নমনীয়তা, অনুমান ক্ষমতা, বিচার করার ক্ষমতা, লক্ষ্য এবং প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা নির্ভর। বিপক্ষ খেলোয়াড়দের বল ছুঁড়ে আউট করার মধ্যে অনুমান ক্ষমতা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের বিশেষ প্রয়োজন। বলের স্পর্শ থেকে শরীরকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে নমনীয়তা এবং প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। খেলাটির সঙ্গে বহুল প্রচলিত Poison Ball বা 'বিষবল' নামক বিনোদন মূলক খেলার সাযুজ্য রয়েছে। এই খেলাটি থেকে বিষবল নামক খেলার উৎপত্তি সেটি অনুমান করা অনর্থক নয়।

(গ) খেলার নাম	ঃ	**রুমাল চুরি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালক-বালিকা
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৬-৭ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	একটি রুমাল বা কাপড়ের টুকরো
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি ছেলে ও মেয়ে অর্থাৎ উভয়েরই দলবদ্ধ খেলা। খেলার শুরুতে চোর নির্বাচনের যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে একজনকে চোর নির্বাচন করা হয়। অবশিষ্ট সমস্ত খেলোয়াড়রা বৃত্তাকারে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে। 'চোর' একটি রুমাল নিয়ে খেলোয়াড়দের পেছনে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে সে খুব সাবধানে সবার অলক্ষ্যে রুমালটি যে কোন একজনের পেছনে রেখে দেয়। যার পেছনে রুমালটি রাখে, সে বুঝতে

না পারলে খুব দ্রুত ঘুরে এসে চোর তার পিঠে কিল বসিয়ে দেয়। রুমাল রাখার বিষয়টি যে খেলোয়াড় আগে বুঝতে পারে সে তখন রুমালটি নিয়ে আবার ঘুরতে থাকে। চোর তার জায়গায় এসে বসে পড়ে। এভাবে খেলাটি দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ অনুমান ক্ষমতা নির্ভর। চোর সবার পেছনে ঘুরতে ঘুরতে রুমালটি একজনের পেছনে রেখে দেয়। যার পেছনে রেখেছে তৎক্ষণাৎ তাকে রুমালটি নিয়ে আবার ঘুরতে হয় এবং একই ভাবে যে কোন একজনের পেছনে রাখতে হয়। সবার দৃষ্টি এড়িয়ে এই রাখার কৌশল এবং যার পেছনে রেখেছে তার বোঝার অনুমান ক্ষমতা এই খেলাটির উল্লেখযোগ্য দিক।

সংযোজন ঃ মযহারুল ইসলাম তরু খেলাটি প্রসঙ্গে বলেছেন, "রুমাল চুরি খেলায় গ্রাম্য সমাজের ছবি আছে। চুরি সমাজের চোখে অপরাধ। মারধোর করে চোরকে শাস্তি দেওয়া হয়। সমাজ জীবনে এরূপ একটি ঘটনা বালক-বালিকারা খেলার ভেতর দিয়ে অভিনয় করে থাকে।"[৭]

(ঘ) খেলার নাম	ঃ	**সাততালি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১২ বছরের বালক-বালিকা
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৫-৬ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলী ও অন্যান্য জেলা।

খেলার পদ্ধতি ঃ

চোর নির্বাচনের যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে একজনকে চোর নির্বাচিত করা হয়। খেলার শুরুতে যে কোন একজন খেলোয়াড় চোরের হাতে তালি মারতে থাকে। সাতটি তালি মারার সঙ্গে সঙ্গেই খেলোয়াড়টি ও সহযোগী খেলোয়াড়রা দ্রুত বসে পড়ে। চোর চেষ্টা করে দাঁড়ানো অবস্থায় খেলোয়াড়দের মাথা ছুঁতে। আর খেলোয়াড়রা তার বিপরীত। অর্থাৎ খেলোয়াড়রা কিছুতেই দাঁড়ানো অবস্থায় ছুঁতে দেবে না। যদি কাউকে দাঁড়ানো অবস্থায় ছুঁয়ে দেয়, তবে সে চোর হয়। এই ভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ খেলাটি প্রতিবর্তক্রিয়া, প্রতিক্রিয়ার সময় ও অনুমান ক্ষমতা নির্ভর। খেলোয়াড়দের দ্রুত ছোঁয়ার ক্ষেত্রে, ছোঁয়া বাঁচিয়ে দ্রুত বসে পড়ার ক্ষেত্রে এবং চোরের দৃষ্টি এড়িয়ে ঠিক সময় দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে উপরোক্ত দক্ষতাগুলি একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

স্থান ভেদে ঃ—

যে কোন খেলাতেই স্থানের প্রয়োজন। এই স্থানকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা - জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ। বর্তমান গ্রন্থে শুধুমাত্র জল এবং স্থলে অনুষ্ঠিত হয় এমন লোকক্রীড়াগুলিকে শ্রেণী বিন্যাসের প্রয়োজনে বিভক্ত করা হয়েছে। স্থলের খেলাগুলিকে গাছের এবং ডাঙার এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার ডাঙার খেলাগুলিকে ঘরের ভেতরের এবং ঘরের বাইরের এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী জলের, গাছের, ঘরের ভেতরের ও ঘরের বাইরের কিছু লোকক্রীড়া নিম্নে তুলে ধরা হল।

জলের খেলা ঃ

(ক) খেলার নাম	ঃ **হউড়ি খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ ১০-১৫ বছরের বালক
সংখ্যা	ঃ দলবদ্ধ, ৪-৫ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ একটি পাটকাঠি বা ঘাসের টুকরো যা ভাসমান
খেলার সময়	ঃ স্নানের সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

একদল বালক পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে বৃত্তাকারে জলের মধ্যে দাঁড়ায়। একজন একটি ঘাসের টুকরো বা পাটকাঠির টুকরো মুখ থেকে ঐ বৃত্তের মধ্যে ফেলে। সবাই সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাটকাঠিটিকে জলকে আন্দোলিত করে হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। এবার যে পাটকাঠিটি পায় সে 'হউড়ি' বলে ডুব দেয়। এবার বাকি সমস্ত খেলোয়াড় তাকে ছোঁয়ার বা ধরার চেষ্টা করে। ছুঁয়ে দিলে আবার নুতন করে খেলা শুরু হয়। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ সহনশীল শক্তি ও শ্বাস ধারণ ক্ষমতা (Breath holding capacity) নির্ভর। 'হউড়ি' বলে দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটার সময় সার্বিক শারীরিক সক্ষমতার বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ করে সাঁতারে সহনশীল শক্তি এবং জলে ডুবে থাকার সময় শ্বাস ধারণ ক্ষমতার উপর খেলাটির দক্ষতা নির্ভর করে।

(খ) খেলার নাম	ঃ **নলছিটি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ ১০-১৫ বছরের বালক
সংখ্যা	ঃ দলবদ্ধ, ন্যূনতম ৫-৬ জন।
উপকরণ	ঃ উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ স্নানের সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

খেলোয়াড়রা সমান সংখ্যায় দুটি দলে বিভক্ত হয়। একদল ধাবকের ও একদল অনুধাবকের ভূমিকা গ্রহণ করে। একদল সাঁতার দিয়ে বলে 'নলছিটি'। এবার অন্যদল ঐ দলের যে কোন একজনকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। স্পর্শ করলেই খেলোয়াড় 'মোর' হয়ে যায়। একটি দলের সকল খেলোয়াড় 'মোর' হয়ে গেলে অন্যদল 'নলছিটি' দেয়। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে চলে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটিও মূলতঃ সার্বিক সক্ষমতা এবং শ্বাস ধারণ ক্ষমতা নির্ভর। দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটার সময় সার্বিক সক্ষমতা এবং জলে ডুবে থাকার সময় শ্বাস ধারণ ক্ষমতার বিশেষ প্রয়োজন। সাঁতার কাটার সময় শরীরের সমস্ত অঙ্গের সঞ্চালন লক্ষ্য করা যায়।

(গ) খেলার নাম	ঃ	**হোলডুগ খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালক
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৪-৫ জন বা ততোধিক।
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	স্নানের সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

একদল বালক সমবেত হয়। এর মধ্য থেকে একজন টসে বা আপসে দান পায়। এরপর উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক ছড়া দিয়ে খেলা শুরু হয়। ছড়ায় থাকে নিজ বীরত্বের ভাব অথবা অপরের প্রতি অবমাননাকর উক্তি। যে দান পায় সে হাতে জল নিয়ে প্রশ্ন করে, অন্যেরা উত্তর দেয়—

এট্যা কি?
— দুধ।
এট্যা কি?
— ভ্যাল।
এট্যা কি?
— মরিচ।
বাপ বলে ধরিস।

ধরিস বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্তা ডুব দিয়ে পালিয়ে যায়। অন্য খেলোয়াড়দের কাজ হল তাকে ধরা বা ছোঁয়া। প্রথম যে স্পর্শ করে পরের দানে সেই ডুব দেওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে অনেক সময় ধরে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ সার্বিক সক্ষমতা ও শ্বাস ধারণ ক্ষমতা নির্ভর। ডুব দিয়ে

পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যে এবং অন্য খেলোয়াড়দের ছোঁয়ার জন্য ছোটাছুটি করতে ক্ষিপ্রতা ও দীর্ঘক্ষণ শ্বাস ধারণ ক্ষমতার বিশেষ প্রয়োজন। আনন্দ এবং ব্যায়ামের উপকারিতা দুই-ই এই খেলার মধ্যে পাওয়া যায়।

(গ) খেলার নাম ঃ **আবুর মার টাবুর টুবুর**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী ঃ অল্প বয়সী বালক ও বালিকা
সংখ্যা ঃ দলবদ্ধ, ৪-৫ জন বা ততোধিক।
উপকরণ ঃ একটি কচুরি পানা
খেলার সময় ঃ দুপুরে স্নানের সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল ঃ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলী ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

প্রথমে খেলোয়াড়রা বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। এর মধ্যে যে কোন একজন মাথায় একটি কচুরীপানা নেয়। প্রশ্ন উত্তর মূলক ছড়ার মাধ্যমে খেলা শুরু হয়। কচুরীপানা মাথায় ছেলেটিকে অন্য খেলোয়াড়রা প্রশ্ন করে — "কাউয়ারে কাউয়া তোর মাথায় কি? কচুরীপানা মাথায় ছেলেটি জবাব দেয়, 'বগার ডিম।' অন্যেরা আবার প্রশ্ন করে - 'জলে ফেললে ভাসবে?' উত্তর দেয় - 'ভাসবে'। এভাবে ছড়া কাটা শেষ হলেই কচুরীপানা মাথায় ছেলেটি কচুরীপানাটি জলে ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত খেলোয়াড় একসঙ্গে হাতের তালু দিয়ে জলে চাপড় মারে আর বলে, 'আবুর মার টাবুর টুবুর'। অর্থাৎ কচুরীপানাটি হারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এরপর সেই হারানো কচুরীপানাটি যে পাবে সে সঙ্গে সঙ্গে জলে ডুব দিয়ে পালাবে। যাতে অন্যেরা ছুঁতে না পারে। ছুঁয়ে দিলে আবার নতুন করে খেলা শুরু হয়। এ ভাবে দীর্ঘক্ষণ খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটিতে শ্বাস ধারণ ক্ষমতা ও সার্বিক সক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। সাঁতারে পটুত্ব বৃদ্ধিতে এই খেলাটি সহায়ক।

গাছের খেলা ঃ

(ক) খেলার নাম ঃ **ডোল খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী ঃ ১২-১৬ বছরের বালক
সংখ্যা ঃ দলবদ্ধ, ৪-৫ জন বা ততোধিক।
উপকরণ ঃ কয়েকটি পাতা
খেলার সময় ঃ বিশেষ করে গ্রীষ্মের দুপুর
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা ও অন্যান্য জেলা
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা ঃ ঝোল, ঝাই-ঝাপ্পা

খেলার পদ্ধতি ঃ

গ্রীষ্মের দুপুরে কোন বাগানে ডোল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। ডোল খেলাটি শুরু হয় খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনুযায়ী পাতা সংগ্রহের মাধ্যমে। অর্থাৎ যতজন খেলোয়াড় এই খেলায় অংশগ্রহণ করে ততটি পাতা খেলোয়াড়দের সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত পাতাগুলির মধ্যে কোন একটি পাতাকে কোন একজন খেলোয়াড় ছিদ্র করে। এবার সমস্ত পাতাগুলি এক জায়গায় করে খেলোয়াড়দের একটি করে পাতা টানতে বলা হয়। পাতা বণ্টনের পর যার ভাগ্যে ছিদ্র যুক্ত পাতা পড়ে সে চোর হিসাবে নির্বাচিত হয়। তারপর খেলার প্রয়োজনে একটি গাছ নির্বাচন করা হয়। ঐ গাছে চোর ছাড়া সবাই ওঠে। চোর ঐ গাছ থেকে প্রায় ১৫-২০ ফুট দূরত্বে যে কোন গাছ বা নির্দিষ্ট কোন বস্তু ছুঁয়ে আসে। চোরের এই ছুঁয়ে আসার ফাঁকে সমস্ত খেলোয়াড়রা গাছে উঠে পড়ে। চোর নির্দিষ্ট বস্তু ছুঁয়ে এসে ঐ গাছের খেলোয়াড়দের মধ্যে কাউকে গাছে উঠে বা মাটি থেকে ছুঁয়ে ফেলার চেষ্টা করে। যদি ছুঁয়ে দিতে পারে তবে যাকে ছুঁয়েছে সে খেলার পরবর্তী অংশের জন্য চোর হিসাবে নির্বাচিত হয়। কিন্তু যদি চোরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে এক বা একাধিক খেলোয়াড় গাছ থেকে মাটিতে নামতে পারে তবে চোর চোরই থাকে। আবার পূর্বের মত সে চোর গাছ বা নির্দিষ্ট বস্তু ছুঁতে যাবে এবং একই ভাবে ছুঁয়ে এসে অন্য খেলোয়াড়দের ছোঁয়ার চেষ্টা করবে। এই ভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে ডোল খেলাটি চলতে থাকে। খেলাটি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য গাছ থেকে কোন খেলোয়াড় লাফিয়ে পড়ার সময় 'ডোল' উচ্চারণ করে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ পেশী শক্তি, স্নায়ু-পেশীর সমন্বয়, অনুমান ক্ষমতা, বিস্ফোরক শক্তি ও ভারসাম্য নির্ভর। দ্রুত গাছে ওঠা, এক ডাল থেকে আর এক ডালে যাওয়া, সরু ডালে বসে থাকা ইত্যাদির মধ্যে পেশী শক্তি, বিস্ফোরক শক্তি ও ভারসাম্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। চোরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ঠিক সময়ে গাছ থেকে 'ডোল' দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুমান ক্ষমতা বিশেষ প্রয়োজন।

(খ) খেলার নাম	ঃ	আমপাতা
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১২-১৫ বছরের বালক
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, খেলোয়াড় সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়।
উপকরণ	ঃ	একগুচ্ছ আমপাতা
খেলার সময়	ঃ	দুপুর বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

আমপাতা খেলাটি বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন গ্রামের অল্পবয়সী ছেলেদের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। সাধারণতঃ দুপুরবেলা কোন বাগানে অথবা বাড়ীর অঙ্গন সংলগ্ন গাছে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আঙ্গুল ফুটিয়ে চোর নির্বাচন করা হয়। ফোটানো আঙ্গুল যে ধরে সে চোর হয়। খেলা শুরুর পূর্বে যে গাছটি খেলার জন্য নির্বাচিত হয় তাকে কেন্দ্র করে মাটির ওপর কাঠি দিয়ে বৃত্ত আঁকা হয়। সেই বৃত্তের মধ্যে একগুচ্ছ আমপাতা রাখা হয়। খেলার সময় চোর বাদে বাকি খেলোয়াড়রা গাছে উঠে পড়ে। তখন চোর বৃত্তের কাছে থাকে এবং সে চেষ্টা করে গাছে ওঠা খেলোয়াড়দের মধ্যে কাউকে ছুঁয়ে ফেলতে। অপরদিকে খেলোয়াড়রা চেষ্টা করে চোরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে গাছের নীচে নেমে বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত পত্র গুচ্ছকে চুম্বন করতে। খেলা চলাকালীন চোর যদি কাউকে ছুঁয়ে দেয় তবে সেই খেলোয়াড় খেলার পরবর্তী অংশের জন্য চোর বলে নির্বাচিত হয়। খেলার সময় চোর মুখে ছড়া কাটতে থাকে—

"চি চিটকা আমের বোল, গাছে উঠি মারি শোল,
শোলের কপালে ফোঁটা, খেড়ুমারি গোটাগোটা।"

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটিও মূলতঃ পেশী শক্তি, বিস্ফোরক শক্তি, অনুমান ক্ষমতা, সর্বোপরি সার্বিক সক্ষমতা নির্ভর। দ্রুত গাছে ওঠার ক্ষেত্রে পেশী শক্তি ও বিস্ফোরক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। চোরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে গাছ থেকে নেমে পত্রগুচ্ছকে চুম্বন করার অনুমান ক্ষমতা ও কৌশল বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

সংযোজন ঃ খেলাটি প্রসঙ্গে ড. আশরাফ সিদ্দিকী বলেছেন, "ব্যাঘ্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোন প্রক্রিয়ারও এটি 'সারভাইভাল' হতে পারে।"[৮]

(গ) খেলার নাম	ঃ	**গাছবাগাড়ী**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১৫-১৮ বছরের যুবক
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৪-৫ জন বা ততোধিক।
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	দুপুর বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও অন্যান্য জেলা
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	গাছ মাকাড়ী, গাছ বাঁদরি, ঝারলঝাপ

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই লোকক্রীড়াটি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের কিছু অংশে বহুল প্রচলিত। সাধারণতঃ গ্রীষ্মের দুপুরে যুবকেরা এই খেলাটি খেলে। এই খেলায় একটি শাখা প্রশাখা যুক্ত গাছের প্রয়োজন। খেলোয়াড় সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। ১০-১২ জনের বেশী বা কম দুই-ই হতে পারে। এই খেলায় একজনকে চোর নির্বাচন করা হয়। খেলা শুরু হলে খেলোয়াড়রা গাছের একডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে বেড়ায়। চোর তাদের ছোঁয়ার জন্য তাড়া করে। চোর কাউকে ছুঁয়ে দিলে স্পর্শকারী ব্যক্তি চোর হয়। এভাবে দীর্ঘক্ষণ খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি পেশীশক্তি, সমন্বয়, ভারসাম্য ও বিস্ফোরক শক্তি নির্ভর। গাছে দ্রুত ওঠার ক্ষেত্রে এবং এক ডাল থেকে অন্য ডালে দ্রুত যাওয়ার ক্ষেত্রে পেশীশক্তি, সমন্বয় ও ভারসাম্যের বিশেষ প্রয়োজন। সার্বিক শারীরিক সক্ষমতা যুক্ত খেলোয়াড়রা এই খেলায় পারদর্শী হয়।

সংযোজন ঃ খেলাটি প্রসঙ্গে সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "লোকক্রীড়াটির অন্তর্নিহিত অর্থ দ্বিবিধ। একদল শাখা প্রশাখা যুক্ত গাছে উঠে এ ডাল থেকে ও-ডালে লাফ ঝাঁপ দেয় - কানি পেছনে তাড়া করে স্পর্শ করতে চায়। প্রথম অর্থে 'কানি' কোন হিংস্র জন্তুর প্রতীক এবং খেলুড়েরা বন্য মানুষ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানুষ হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য গুহা বা গাছের আশ্রয় নিত। গাছবাগাড়ি খেলায় হিংস্র জন্তুর থেকে পরিত্রাণের দৃশ্যটি প্রতিভাত হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থে কোন গৃহস্থের ফলের বাগান থেকে বাঁদর ছেলেদের ফল চুরি এবং গৃহস্বামীর পশ্চাৎধাবন খেলাটির মধ্যে প্রতিফলিত হতে পারে। 'মাকড়' অর্থে আবার বাঁদরের অনুকরণে গাছে লম্ফ প্রদান করা হয় বলে খেলাটির নাম গাছবাঁদারি/গাছমাকড়ি নামকরণ হতে পারে।"[২]

(ঘ) খেলার নাম	ঃ	**আবদুল খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১২-১৬ বছরের যুবক
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৪-৫ জন বা ততোধিক।
উপকরণ	ঃ	একটি লাঠি
খেলার সময়	ঃ	দুপুর বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

বিশেষ করে এই খেলাটি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার একটি জনপ্রিয় খেলা। গ্রীষ্মের দুপুরে কোন বাগানবাড়ীতে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। ১২-১৬ বছরের ছেলেরা সাধারণতঃ এই খেলাটি খেলে। রাম দুই স্লাড়ে তিন — আমাবশ্যায় ঘোড়ার ডিম — এ ছড়াটির মাধ্যমে চোর নির্বাচিত করা হয়। খেলার উপকরণ হিসাবে একটি লাঠি ও একটি গাছ ব্যবহৃত হয়। একটি নির্দিষ্ট গাছের নীচে সবাই সমবেত হয়। খেলোয়াড়দের মধ্যে যে কোন একজন লাঠিটি তিনবার গাছে ছোঁড়ে এবং চতুর্থবার লাঠিটি গাছ থেকে দূরে কোথাও ছোঁড়ে। এবার ছোঁড়া লাঠিটিকে চোরকে কুড়িয়ে আনতে হয়। কুড়িয়ে আনার ফাঁকে খেলোয়াড়রা গাছে উঠে পড়ে যাতে চোর তাদের নাগাল না পায়। চোর লাঠিটি কুড়িয়ে এনে গাছে তিনবার ছোঁড়ে এবং চতুর্থবার খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে মারে। লাঠিটি কাউকে স্পর্শ করে পড়ার সময় যদি চোর ধরতে পারে তবে যাকে স্পর্শ করেছে সে চোর হয়। কিন্তু যদি লাঠিটি কাউকে স্পর্শ না করে মাটিতে পড়ে তখন খেলোয়াড়রা দ্রুত গাছ থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামে। যে সবার আগে গাছ থেকে নামতে পারে সেই - আবদুল। অর্থাৎ

সেই খেলার বিজয়ী।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি পেশীশক্তি, গতি, স্নায়ু-পেশীর সমন্বয় ও অনুমান ক্ষমতা নির্ভর। লাঠি কুড়িয়ে আনার ক্ষেত্রে গতি, দ্রুত গাছে ওঠার ক্ষেত্রে পেশীশক্তি ও বিস্ফোরক শক্তি এবং লাঠি গাছে ও দূরে ছোঁড়ার ক্ষেত্রে হাতের পেশীশক্তির প্রয়োজন এই খেলায় লক্ষ্য করা যায়। লাঠি উপরে ছুঁড়ে দ্রুত ধরার ক্ষেত্রে স্নায়ু-পেশীর সমন্বয় ও অনুমান ক্ষমতা প্রয়োজন।

ঘরের ভেতরের খেলা ঃ

(ক) খেলার নাম	ঃ	**রস-কষ**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালক বালিকা
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৪-৫ জন বা ততোধিক।
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	দিনের যে কোন সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি বালক-বালিকা উভয়েই খেলে। খেলোয়াড় সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, যতজন খুশি অংশগ্রহণ করতে পারে। খেলার শুরুতে প্রত্যেক খেলোয়াড় তাদের একটি হাত মাটিতে রাখে। যে কোন একজন আঙুলে টোকা দিয়ে গণে — রস, কষ, সিংহ, বুলবুলি, মস্তক। 'মস্তক' শব্দটি যার আঙুলে এবং যে আঙুলে গিয়ে পড়ে সেই আঙুলটি মুড়ে দেয়। এভাবে সমস্ত আঙুল মুড়ে গেলে সে উঠে যায়। এভাবে সবাই উঠে যাবার পর একজন অবশিষ্ট থাকে। সে 'চোর' বলে বিবেচিত হয়। এবার সবাই মিলে চোরকে শাস্তি দেয়। চোর তার ডান হাতটি খুলে মাটিতে লম্বভাবে রাখে। সফল খেলোয়াড়রা একে একে তাদের দুহাত চোরের হাতের দু-পাশে রেখে ডানদিক ও বামদিক থেকে চড় মারতে শুরু করে। চোর সুযোগ বুঝে হাতটি সরিয়ে নিতে পারলে অর্থাৎ চড় মারার সময় ফসকে গেলে চোর মুক্ত হয়। এভাবে সবাই এক এক করে চোরকে একই পদ্ধতিতে শাস্তি দেয়। এ ভাবে খেলাটির সমাপ্তি ঘটে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ বিনোদন মূলক। আঙুল ছড়িয়ে দেওয়া এবং মোড়ার ক্ষেত্রে আঙুলের সঞ্চালন ঘটে। এছাড়া চোরকে শাস্তি দানের সময় চোরের দ্রুত হাত সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে অনুমান ক্ষমতা ও প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়।

(খ) খেলার নাম	ঃ	**ভাত ভাত খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালিকা

সংখ্যা	দুই বা দুইয়ের অধিক, খেলোয়াড় সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়
উপকরণ	কচু পাতা, উনুন, একটি কাঠি
খেলার সময়	দিনের যে কোন সময়, বিশেষ করে দুপুরে
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর

খেলার পদ্ধতি ঃ

ভাত ভাত খেলা মূলতঃ মেয়েদের খেলা। দুজন অথবা দুজনের বেশী একসঙ্গে খেলতে পারে। একটি কচুপাতায় কিছু মাটির গুঁড়ো নেওয়া হয় যেগুলি চাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মাটি দিয়ে উনুন তৈরী করা হয়। কচু পাতাকে ভাতের হাঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অনুরূপ ভাবে কিছু ধুলো-বালিকে চাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এবার চাল সহ হাঁড়িটিকে উনুনে চাপানো হয়। ভাত রান্না হয় এবং পর্যায়ক্রমে ডাল, তরকারীও। একটি কাঠিও ব্যবহৃত হয়, যা হাতা বা চামচ হিসাবে কাজ করে। এই কাঠিটিকে বলা হয় "চেল্লি"। রান্না সম্পন্ন হলে সবাই একসঙ্গে খাবার গ্রহণ করে। খাবার শেষে বাসন মাজে। খেলা শেষ হয়।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ বিনোদন মূলক। অবসর সময় বিনোদন মূলক কাজে অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যই এই খেলার মূল লক্ষ্য। তাছাড়া অভিনয় ধর্মী গুণও এই খেলার অন্য আর একটি দিক। রান্না-বান্নার কাজ মূলতঃ মেয়েদেরই করতে হয়। সেক্ষেত্রে খেলাটিকে ভবিষ্যতের মহড়াও বলা যেতে পারে।

(গ) খেলার নাম	ঃ	**চোর পুলিশ**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালক-বালিকা
সংখ্যা	ঃ	নির্দিষ্ট, চার জন
উপকরণ	ঃ	৪টি ছোট চৌকোণাকৃতির কাগজ
খেলার সময়	ঃ	দিনের যে কোন সময়, মূলতঃ বৃষ্টির দিনে
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, বীরভূম, বর্ধমান ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটির খেলোয়াড় সংখ্যা নির্দিষ্ট। চারজন এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। খেলা শুরুর পূর্বে ৪টি কাগজের টুকরোতে লিখতে হয় — দারোগা-১০০০, পুলিশ-৮০০, ডাকাত-৬০০ এবং চোর-৪০০। এবার কাগজের টুকরোগুলোকে মুড়ে সামনে ফেলা হয়। যে ফেলে সে সবার শেষে তোলে। এবার যে দারোগা পায় সে বলে 'পুলিশ পুলিশ কা হো' - পুলিশ উত্তর দেয় 'হাম হো'। দারোগা তখন পুলিশকে বলে - 'চোর বা ডাকাত' কো পাকড়াও। পুলিশ এবার চোর বা ডাকাতকে খুঁজে বের করে। যদি বলতে পারে তাহলে সে

পুরো নম্বর পায়। চোর বা ডাকাত সে ক্ষেত্রে 'শূন্য' নম্বর পায়। বলতে না পারলে চোর বা ডাকাত তাদের প্রাপ্য নম্বর পায় ও পুলিশ 'শূন্য' নম্বর পায়। উল্লেখ্য দারোগা সর্বদা তার প্রাপ্য নম্বর পায়। এই ভাবে যে সবচেয়ে বেশী নম্বর পায় সে রাজা, দ্বিতীয়জন রাণী, তৃতীয়জন মন্ত্রী এবং চতুর্থজন মেথর বলে পরিগণিত হয়। এই ভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ অবসর বিনোদন নির্ভর। খেলাটিতে 'চোর' বা 'ডাকাত' খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে প্রখর অনুমান ক্ষমতার প্রয়োজন। খেলার সমাপ্তিতে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করার বিষয়টি এই খেলার একটি অন্যতম শিক্ষামূলক দিক।

(ঘ) খেলার নাম	ঃ **রান্না-বান্না খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ ৮-১২ বছরের বালক-বালিকা
সংখ্যা	ঃ দলবদ্ধ, ৬-৭জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ একটি ছোট কাঠি, পাতা, খোলা ইত্যাদি
খেলার সময়	ঃ দিনের যে কোন সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। খেলাটিতে বড়দের সাংসারিক কাজ কর্মের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। এই খেলায় খেলোয়াড়রা পাতার ছাউনি দিয়ে ঘর বানায়, ঘর লেপে, উনুন তৈরী করে, ধুলো-বালি দিয়ে ভাত রান্না করে। খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ কেউ আশপাশের ঝোপঝাড়ে বাজার করতে যায়, বিভিন্ন সামগ্রী কিনে আনে এবং সেগুলি রান্নার কাজে ব্যবহার করে। মাটির হাঁড়ির ভাঙ্গা অংশকে রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহার করে। রান্না শেষে সমস্ত খেলোয়াড় খেতে বসে এবং ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে এক ধরনের শব্দ করে পরম আনন্দে খায়। খাওয়ার শেষে রাত হয়েছে বলে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। সবাই চোখ বুজে ঘুমায়, বেঘোরে নাক ডাকে। একটু পরেই সবাই আবার জেগে ওঠে, হেঁসে লুটোপুটি খায়। এভাবেই খেলাটি সমাপ্তি ঘটে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ বিনোদন নির্ভর। অভিনয় ধর্মী গুণ এই খেলার আর একটি অন্যতম দিক। বড়দের সাংসারিক কার্যক্রম অনুসরণ করার বিষয়টি এই খেলার মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এই খেলাটিকে শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনের মহড়াও বলা যেতে পারে।

সংখ্যা ভেদে ঃ—

সংখ্যা যে কোন খেলার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। শিষ্টক্রীড়া গুলিতে এর গুরুত্ব সর্বাধিক। লোকক্রীড়া গুলিতে এর সর্বাধিক গুরুত্ব না থাকলেও কিছু কিছু লোকক্রীড়ায় এর গুরুত্ব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই গুরুত্বকে অনুধাবন করে বর্তমান গ্রন্থে সমস্ত

লোকক্রীড়াগুলিকে সংখ্যা ভেদে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা - দলগত ও দলগত নয়। দলগত খেলাগুলি দলের সমস্ত খেলোয়াড়দের পারদর্শিতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দলগত নয় এমন খেলাগুলি মূলতঃ ব্যক্তিগত পারদর্শিতা নির্ভর। একক খেলায় আনন্দ নেই। ন্যূনতম দুজন প্রয়োজন। সে বিষয়টি অনুধাবন করে সর্বাধিক তিনজন অংশগ্রহণ করতে পারে এমন খেলা গুলিকে দলগত নয় এবং তিনের অধিক একটি দলে অংশগ্রহণ করতে পারে এমন খেলাগুলিকে দলগত, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী নিম্নোক্ত লোকক্রীড়াগুলি তুলে ধরা হয়েছে —

দলগত খেলা ঃ

(ক) খেলার নাম	ঃ	**এলাণ্ডি লণ্ডন**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১২ বছরের বালক
সংখ্যা	ঃ	৬-৭জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম ও অন্যান্য জেলা
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	লণ্ডন, স্ট্যাচু, স্টপ গো ইত্যাদি।

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি একান্তভাবে বালকদের দলবদ্ধ খেলা। 'চোর' নির্বাচনের যে কোন পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্য দিয়ে খেলা শুরু হয়। প্রায় ১৫ ফুট দূরত্বে দুটি দাগ কাটা হয়। এই দুটি দাগের একটিতে চোর ও অন্যটিতে বাকি খেলোয়াড়রা অবস্থান করে। এবার সমস্ত খেলোয়াড়রা (চোর বাদে) নিজেদের দাগ পেরিয়ে চোরের দাগের দিকে এগোয় এবং সমস্বরে আওয়াজ করে 'এলাণ্ডি লণ্ডন'। এই আওয়াজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোর পেছনে ফিরে তাকায়। তাকানোর সময় সমস্ত খেলোয়াড় যে যেমন অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায় অনড় (statue) ভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ একদম নড়বে না। যদি কেউ নড়ে এবং চোর যদি তা দেখে ফেলে তবে যাকে দেখেছে সে চোর হয়। এছাড়াও চোরের কাছাকাছি এসে চোরকে স্পর্শ করে চোরের আগে যদি নির্দিষ্ট দাগে ফিরে যেতে পারে তবে চোর চোরই থাকে। আর চোর যদি ঐ খেলোয়াড়ের আগে ঐ দাগে পৌঁছাতে পারে তবে স্পর্শকারী ব্যক্তি চোর হয়। এ ভাবে খেলাটি অনির্দিষ্টকাল সময় ধরে চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি গতি, শক্তি ও ভারসাম্য নির্ভর। চোরকে স্পর্শ করে নির্দিষ্ট দাগে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গতি ও শক্তি বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া 'এলাণ্ডি লণ্ডন' বলার সঙ্গে সঙ্গে অনড় হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ে।

(খ) খেলার নাম	ঃ	**ইঁদুর বিড়াল**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১২ বছরের বালক

সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৬-৭জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুলি, দার্জিলিং ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি একান্তভাবে বালকদের খেলা। খেলায় যতজন খুশী অংশগ্রহণ করতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজনকে ইঁদুর ও একজনকে বিড়াল নির্বাচন করা হয়। ইঁদুর ও বিড়াল ছাড়া সমস্ত খেলোয়াড়রা বৃত্তাকারে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়ায়। ইঁদুর বৃত্তের ভেতরে এবং বিড়াল বৃত্তের বাইরে অবস্থান করে। বিড়াল বৃত্ত ভেদ করে ইঁদুরকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। ইঁদুর বিড়ালের ছোঁয়া বাঁচিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করে। যদি বিড়াল কোন ভাবে ইঁদুরকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে ইঁদুর বিড়াল এবং বিড়াল ইঁদুর হয়। উল্লেক্য বৃত্তাকারে দাঁড়ানো খেলোয়াড়রা ইঁদুরের সহযোগীর ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে। কারণ বিড়াল বৃত্ত ভেদ করার চেষ্টা করলে তারা সক্রিয়ভাবে বাঁধা দেয়। কিন্তু ইঁদুর আনায়াসে বৃত্ত ভেদ করতে পারে। এভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি হাতের পেশীশক্তি, ক্ষিপ্রতা, নমনীয়তা, অনুমান ক্ষমতা ও গতি নির্ভর। বৃত্ত ভেদ করে বিড়ালের ইঁদুরকে ধরার মধ্যে এবং ইঁদুরের বিড়ালের স্পর্শ বাঁচিয়ে ছোটাছুটি করার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত সমস্ত গুণ গুলির বিশেষ প্রয়োজন। খেলাটিতে বিড়াল ও ইঁদুরের চির শত্রুতার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে।

(গ) খেলার নাম	ঃ	**রাজার কোটাল**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১২ বছরের বালক
সংখ্যা	ঃ	সাধারণতঃ ৫ জনের অধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো প্রচলিত আছে যদিও ততোধিক জনপ্রিয় নয়। খেলাটি শুরুর পূর্বে একটি বৃত্ত অঙ্কন করা হয়। খেলাটি দলবদ্ধ খেলা। এই খেলায় বৃত্তের বাইরে একজন এবং বাকি খেলোয়াড়রা বৃত্তের ভেতরে থাকে। খেলাটি মূলতঃ অভিনয়ধর্মী। বৃত্তের বাইরের খেলোয়াড়টি 'রাজার কোটালের' ভূমিকায় এবং বৃত্তের ভেতরের খেলোয়াড়রা 'চাষী' এবং 'চাষীর কলাবাগানের কাঁদির' ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে।

খেলাটিতে রাজার কোটাল বৃত্তের বাইরে ঘুরতে থাকে। বৃত্তের ভেতরের খেলোয়াড়রা চাষীর মুষ্টিবদ্ধ হাতের উপর তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলি রাখে। রাজার কোটাল ঘুরতে থাকে তখন চাষী প্রশ্ন করে —

চাষী	-	বাগানের পিছে ঘুরে কে?
কোটাল	-	আমি হলাম রাজার কোটাল।
চাষী	-	কিসের জন্যি ঘোরাঘুরি?
কোটাল	-	এক কাঁদি কলার লাগি।
চাষী	-	কাল যে নিছলা এক কাঁদি?
কোটাল	-	গরুর লাদ পড়ছে।
চাষী	-	ধুইয়া খাও নাই?
কোটাল	-	আরে ছি ছি থু থু।
চাষী	-	তবে আর এক কাঁদি নিয়া যাও।

কথোপকথন শেষে কোটাল বৃত্তের ভেতরের যে কোন একজনকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে এবং আবার ঘুরতে থাকে। চাষীর জিজ্ঞাসার উত্তরে সে আবার বলে সেই কাঁদিটিও সে খেতে পারেনি অন্য কোন কারণে। এভাবে বার বার ঘুরে ঘুরে চাষীর সমস্ত কলার কাঁদি নিয়ে কোটাল চলে যায়।

পর্যবেক্ষন ঃ এই খেলাটি মূলতঃ বিনোদন মূলক। জমিদারদের শোষণের একটি বাস্তব চিত্র এই খেলায় ফুটে ওঠে। জমিদারী প্রথা সম্পর্কে শিশুদের একটি ধারণা তৈরী হয়, যা এই খেলার একটি শিক্ষামূলক দিক। অভিনয় করার পারদর্শিতা এই খেলায় লক্ষ্য করা যায়।

সংযোজন ঃ ড. অসীম দাস খেলাটি প্রসঙ্গে বলেছেন, "সাধারণ মানুষের উপর মধ্যযুগীয় প্রবঞ্চনা ও শোষণের অপর একটি সরলতর চিত্র পাওয়া যায় 'রাজার কোটাল' লোকক্রীড়ায়।"[৪]

ইংজের আমলেও এই ধরনের আইনী শোষণের অবসান হয়নি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, "জমিদারের বা সরকারের অনেক নিম্নতর কর্মচারীদের দ্বারা উৎপীড়িত হত বাংলার গ্রাম সমাজ। চৌকিদার, তহশীলদার প্রভৃতি পদে যারা বৃত থাকত তারা নিরক্ষর এবং সরল গ্রামবাসীকে নানা প্রকারের ভীতি প্রদর্শন করে - নানা প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করত। মনে রাখা দরকার যে, 'মুরগী পয়দা করিল ডিম, খাইল দারোগায়' — এইরূপ প্রবাদ-প্রবচন সমাজে অযথা এবং অনর্থক সৃষ্টি হয় না।"[৪]

(ঘ) খেলার নাম	ঃ	দই-খই-চিড়ে-মুড়ি
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১২ বছরের বালক
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৬ জন
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলায় খেলোয়াড় সংখ্যা নির্দিষ্ট—৬ জন। চোর নির্বাচনের যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে এই ৬ জনের মধ্য থেকে ২ জনকে চোর নির্বাচন করা হয়। খেলার শুরুতেই চারটি আয়তাকার ঘর (প্রতিটি আনুমানিক ২৪ বর্গফুট) তৈরী করতে হয়, যে ঘরগুলির নাম - দই, খই, চিঁড়ে ও মুড়ি। খেলা শুরুর সময় চারজন যে কোন একটি ঘরে দাঁড়ায়। চোর দুজন দুটি লাইনে দাঁড়ায়। চারজন সব সময় চেষ্টা করে একঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে। এই চারজন যাতে অন্য ঘরে যেতে না পারে সে জন্য চোর ২ জন সব সময় সচেষ্ট থাকে। এই চারজন চারটি ঘরে গিয়ে সমস্বরে আওয়াজ করে - 'দই-খই-চিঁড়ে-মুড়ি'। এরপর এই চারজন আবার যে কোন একটি ঘরে মিলিত হলেই এক গেম। এই ভাবে খেলা চলতে থাকে। চোর যদি কাউকে ছুঁয়ে দেয় তাহলে সে চোর হয় আর চোর ঘরে ফিরে যায়। খেলাটি পুনরায় নতুন করে শুরু হয়।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ গতি, ক্ষিপ্রতা, অনুমান ক্ষমতা, নমনীয়তা ও ভারসাম্য নির্ভর। চোরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার ক্ষেত্রে, খুব দ্রুত বিপক্ষকে বোকা বানিয়ে এক ঘরে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং খেলার নির্দিষ্ট দাগের বাইরে না যাবার ক্ষেত্রে গতি, ক্ষিপ্রতা, অনুমান ক্ষমতা ও ভারসাম্যের বিশেষ প্রয়োজন। খেলাটি সার্বিক সক্ষমতা নির্ভরও।

দলগত নয় ঃ

(ক) খেলার নাম	ঃ	**লাঠি টানাটানি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১৮-২৫ বছরের যুবক
সংখ্যা	ঃ	২ জন
উপকরণ	ঃ	একটি লাঠি
খেলার সময়	ঃ	দুপুর বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি বাংলার একটি অতি জনপ্রিয় খেলা। এই খেলায় দুজন করে অংশগ্রহণ করে। উপকরণ হিসাবে একটি শক্ত লাঠি ব্যবহৃত হয়। খেলাটি সাধারণতঃ বলশালী পুরুষদের শক্তি পরীক্ষার খেলা। দুজন খেলোয়াড় মুখোমুখি কোমর সোজা রেখে পরস্পরের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে একে অপরের পায়ের পাতা স্পর্শ করে বসে। দুজনের জোড়া পায়ের উপরে লাঠিটি রাখা হয়। এবার দুজনই লাঠিটি শক্ত করে ধরে। একজন মাঝখানে এবং অন্যজন প্রতিপক্ষের হাত বাদ দিয়ে দুহাতে শক্তমুঠিতে লাঠিটি ধরে। এবার পরস্পর পরস্পরকে পায়ের পাতায় ভর রেখে লাঠি সহ টানতে শুরু করে। কিছুক্ষণ লাঠি টানাটানির পর একজন আর একজনকে টেনে তোলে। অর্থাৎ একজন টানতে টানতে শুয়ে

পড়ে এবং অন্যজন পুরোপুরি দাঁড়িয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়ে সেই পরাজিত হয়। এ ভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ সমটান শক্তি (Isotonic) নির্ভর। হাত, কাঁধ এবং ল্যাটিস, ট্র্যাপিজ, কোমর ও পিঠের পেশীর শক্তি ও সমন্বয়ের উপর খেলোয়াড়ের উৎকর্ষ নির্ভর করে।

(খ) খেলার নাম	ঃ	**ব্যাঙের মাথা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের যুবক
সংখ্যা	ঃ	২ জন
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	দিনের যে কোন সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি দুজন খেলোয়াড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একজন প্রশ্নকর্তা এবং আর একজন উত্তরদাতা। অর্থাৎ খেলাটি মূলতঃ প্রশ্নোত্তরমূলক। এই খেলায় প্রশ্ন কর্তা সবসময়ই জয়ী হয়। প্রথমবার খেলা শেষ হলে দ্বিতীয়বারে উত্তরদাতা প্রশ্নকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। খেলায় উত্তরদাতাকে অনেক অবমাননাকর উক্তি শুনতে হয়। খেলায় ব্যবহৃত প্রশ্নোত্তর মূলক কথোপকথনগুলি নিম্নরূপ —

প্রশ্নকর্তা	-	তোমার সঙ্গে আমার একটি কতা আচে
উত্তরদাতা	-	কি কতা?
প্রশ্নকর্তা	-	ব্যাঙের মাতা।
উত্তরদাতা	-	কি ব্যাঙ?
প্রশ্নকর্তা	-	কোলা ব্যাঙ।
উত্তরদাতা	-	কি কোলা?
প্রশ্নকর্তা	-	গু কোলা।
উত্তরদাতা	-	কি গু?
প্রশ্নকর্তা	-	মানুষের গু
উত্তরদাতা	-	কি মানুষ?
প্রশ্নকর্তা	-	বন মানুষ।
উত্তরদাতা	-	কি বন?
প্রশ্নকর্তা	-	কচু বন।
উত্তরদাতা	-	কি কচু?
প্রশ্নকর্তা	-	মান কচু।

কোন কোন অঞ্চলে নিম্নোক্ত ছড়াও প্রচলিত —

এক জায়গায় যাবি?
কোথা?
ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ?
সরু ব্যাঙ।
কি সরু?
বামন গরু .... ইত্যাদি।

এই ভাবেই দীর্ঘক্ষণ ধরে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ খেলাটি মূলতঃ বিনোদন মূলক। তথাপি ছন্দ মিলিয়ে ছড়া বলার মধ্য দিয়ে মেধা শক্তির বিকাশ এই খেলায় লক্ষ্য করা যায়।

উপকরণ ভেদে ঃ—

উপকরণ যে কোন খেলার একটি প্রয়োজনীয় মাধ্যম। শিষ্টক্রীড়া গুলিতে এর আধিক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়, যা ব্যয় বহুলও বটে। লোকক্রীড়ায় এর আধিক্য না থাকলেও কিছু কিছু উপকরণ ব্যবহৃত হয় যা একান্ত ভাবে দেশীয়, সুলভ ও প্রকৃতি প্রদত্ত। এই উপকরণের বিষয়টি অনুধাবন করে বর্তমান গ্রন্থে উপকরণ ভেদে একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে উপকরণ যুক্ত ও উপকরণ বিহীন লোকক্রীড়াগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পূর্বে উপকরণ বিহীন অনেক লোকক্রীড়া আলোচিত হয়েছে। তাই উপকরণ বিহীন লোকক্রীড়াগুলির এখানে বর্ণনা করা হয়নি। নিম্নে শুধুমাত্র উপকরণ যুক্ত কয়েকটি লোকক্রীড়া তুলে ধরা হল—

উপকরণযুক্ত খেলা ঃ

(ক) খেলার নাম	ঃ	**রশি টানাটানি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১৮-২৫ বছরের যুবক
সংখ্যা	ঃ	নির্দিষ্ট নয়, দু'দলে সমসংখ্যক, ১০-১২ জন
উপকরণ	ঃ	একটি শক্ত রশি বা দড়ি
খেলার সময়	ঃ	দুপুর বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি বাংলার একটি অতি জনপ্রিয় খেলা। পাট বা নারকেল ছোবড়া দিয়ে পাকানো মোটাসোটা ৫/৬ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের ও ২০/২২ হাত লম্বা রশি থাকে। দুদলের সমসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। এক একটি দলে ১০-১২ জন করে খেলোয়াড় থাকে। উভয়পক্ষের প্রধান খেলোয়াড় রশিটি দুই প্রান্তে নিজ নিজ কোমরে পেঁচিয়ে ধরে। রশিটির মধ্যবর্তী অবস্থানের মাটিতে দাগ দিয়ে রেখে উভয় পক্ষের

খেলোয়াড়রা দু দিক থেকে টানতে শুরু করে। এভাবে টানতে টানতে যে পক্ষ মধ্যবর্তী অবস্থান রেখা অতিক্রম করে অপর দলকে নিজেদের দিকে টেনে আনতে পারে সে দল জয়ী হয়।

পর্যবেক্ষণ ঃ খেলাটি মূলতঃ সমটান ও সমদৈর্ঘ্য শক্তি (Isotonic & Isometric), সমন্বয় ও ভারসাম্য নির্ভর।

সংযোজন ঃ খেলাটি প্রসঙ্গে মাযহারুল ইসলাম তরু বলেছেন, 'রশি টানাটানি খেলায় যথেষ্ট শারীরিক শক্তি ও কৌশলের প্রয়োজন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সমতা ব্যতিরেকে পরাজয় অনিবার্য। রশি যথেষ্ট মোটা ও মজবুত না হলে প্রচণ্ড টানাটানির ফলে ছিঁড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আঘাত পাবার আশঙ্কা থাকে।'[৭]

(খ) খেলার নাম	ঃ	**ব্যাঙ বাজি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালক
সংখ্যা	ঃ	নির্দিষ্ট নয়, যত জন খুশি অংশগ্রহণ করতে পারে
উপকরণ	ঃ	মাটির হাঁড়ি বা কলসীর ভাঙা অংশ
খেলার সময়	ঃ	স্নানের সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলায় ছেলেরা কোন পুকুর, নদী বা বিলের ধারে সমবেত হয়। ব্যাঙ বাজি খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে না। খেলার উপকরণ হিসাবে, পাতলা মাটির পাত্রের ২-২১/২ ইঞ্চি মাপের ভাঙা টুকরো ব্যবহৃত হয়। মাটির পাত্রের এই ভাঙা অংশটি স্থানীয় ভাবে 'খোলা' নামে পরিচিত। খেলার পদ্ধতি হিসাবে দেখা যায়, ডাঙায় দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়েরা একে একে জলের উপর দিয়ে খোলাগুলিকে সজোরে নিক্ষেপ করে। তখন খোলাগুলি জলের উপর ব্যাঙের মত লাফিয়ে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে ডুবে যায়। এই ভাবে খেলাটি খেলোয়াড়দের ইচ্ছেমত সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয় যার খোলা লাফিয়ে লাফিয়ে সবচেয়ে বেশি দূরে যায় সে বিজয়ী হয়।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটিতে অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কনুই থেকে Flexion ও পরে Extension হয়। খেলাটি কাঁধের পেশী শক্তি নির্ভর।

আচার ভেদে ঃ—

প্রত্যেক জাতিরই একটি নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি বা আচার বিদ্যমান। ক্রীড়ার জগতেও এর ব্যতিক্রম নেই। বিশেষ করে লোকক্রীড়ায় এর উল্লেখযোগ্য দিক পরিলক্ষিত হয়। এ

বিষয়টি অনুধাবন করে বর্তমান গ্রন্থে আচার ভেদে লোকক্রীড়াগুলির শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে, যেখানে উৎসব কেন্দ্রিক ও উৎসব কেন্দ্রিক নয় এমন লোকক্রীড়াগুলি তুলে ধরা হয়েছে। উৎসব কেন্দ্রিক লোকক্রীড়াগুলিকে ধর্মীয় ও সামাজিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কারণ অনেক লোকক্রীড়ার সন্ধান মিলেছে যেগুলি শুধুমাত্র ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব কেন্দ্রিক কিছু লোকক্রীড়া তুলে ধরা হল।

ধর্মীয় উৎসব কেন্দ্রিক খেলা ঃ

(ক) খেলার নাম	ঃ	**চামড়ি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১৮-২২ বছরের যুবক
সংখ্যা	ঃ	নির্দিষ্ট নয়, ৬-৭ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	একটি করে লাঠি
খেলার সময়	ঃ	দুপুর বেলা, ঈদ পরবের দিন
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি উত্তরবঙ্গের মুসলান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঈদ পরবের দিন অনুষ্ঠিত হয়। দাগ কেটে একটি পুকুর তৈরী করতে হয়। পুকুরের অধিকার নিয়েই খেলাটি। দু'দল লাঠি নিয়ে পুকুরের ধারে জমায়েত হয় পুকুর দখল করতে। সকলে তৈরী হলে একদল পুকুরের ভেতরে এবং একদল পুকুরের বাইরে অবস্থান করে। একদল পুকুরের পাড় থেকে অন্যদলকে তাড়ানোর চেষ্টা করে। আর অন্যদল পুকুর থেকে। এ ভাবেই শুরু হয়ে যায় মারপিঠ, লাঠালাঠি। লাঠির মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করে। কোথাও কোথাও রণবাদ্যের তালেও খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে লাঠালাঠি চলতে চলতে যখন খেলার কৌশল শেষ হয়ে আসে ও ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে তখন সকলে এক সঙ্গে লাঠি তুলে আত্ম সমর্পণ করে। এভাবে খেলাটি শেষ হয়।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটির সঙ্গে হালকা সরঞ্জাম নিয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন খেলাধূলার মিল রয়েছে। স্বভাবতঃই এই খেলাটির মধ্যে পেশীর সমন্বয়, পরিশ্রমের ফলে পেশীর রূপায়িত অবস্থার (Conditioned) পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। খেলাটিতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কৌশল প্রদর্শনের গুণও লক্ষ্য করা যায়।

(খ) খেলার নাম	ঃ	**দধি-কাদ**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১৮-২৫ বছরের যুবক
সংখ্যা	ঃ	২ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন

খেলার সময়	ঃ	জন্মাষ্টমীর দিন
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদীয়া ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। মূলতঃ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই খেলাটি প্রচলিত। পুরুষদের খেলা। দুই বা তার বেশী জন অংশগ্রহণ করতে পারে। একটি বড় মাঠকে জল ঢেলে কাদাযুক্ত করা হয়। সমস্ত অংশগ্রহণকারী শরীরে কাদা মেখে নেয়। দুজন খেলোয়াড় দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে একে অপরকে ঠেলতে শুরু করে। ঠেলতে ঠেলতে যে খেলোয়াড় অন্যজনকে কাদার সীমানা পার করে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে পারে সেই জয়ী হয়। খেলাটি কাদাযুক্ত অংশের মাঝখানে শুরু হয়। কোন কোন অঞ্চলে নারকেল বা ঐ জাতীয় কিছু ফলের কাড়াকাড়িকে কেন্দ্র করেও খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় একজন খেলোয়াড় ফলটিকে দুই বাহু দিয়ে বুকের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখে। অন্য খেলোয়াড়রা সেটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। এভাবে খেলোয়াড়রা ক্লান্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত খেলাটি চলতে থাকে। খেলার স্থলের কাদাগুলি দধির আকার ধারণ করে বলে সম্ভবতঃ এই খেলাটির নাম 'দধি কাদ'।

পর্যবেক্ষণ ঃ খেলাটি মূলতঃ হাতের পেশী শক্তি, সমন্বয় ও ভারসাম্য নির্ভর। বিপক্ষকে ঠেলে মাঠের বাইরে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে হাতের পেশী শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। আবার কাদাযুক্ত স্থানে নিজের শরীরকে ঠিক রাখার ক্ষেত্রে ভারসাম্যের প্রয়োজনও উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ে। অন্য দিকে এই খেলাটির সঙ্গে আমেরিকান ফুটবল খেলার অদ্ভুত মিল রয়েছে।

(গ) খেলার নাম	ঃ	**চেংগি ডাণ্ডি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১৮-২৫ বছরের যুবক
সংখ্যা	ঃ	৮-১০ জন করে, দু'দলে সমসংখ্যক
উপকরণ	ঃ	দেড় হাত ও আধ হাত পরিমাণ দুটি বাঁশের শক্ত কাঠি
খেলার সময়	ঃ	দুপুর বেলা, ঈদের নামাজের পর
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি

খেলার পদ্ধতি ঃ

এটি উত্তরবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি খেলা। ঈদের নামাজের পর খেলাটি মূলতঃ অনুষ্ঠিত হয়। দেড়হাত ও আধহাত পরিমাণ দুটি শক্ত বাঁশের কাঠি এই খেলার উপকরণ। দেড়হাত বাঁশের কাঠির নাম 'ডাণ্ডি' এবং আধহাত কাঠির নাম 'চেংগি'। এই দুয়ে মিলে 'চেংগি ডাণ্ডি'। দুটি দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে খেলাটি শুরু হয়। খেলার জায়গায় একটি দাগ কাটতে হয়। ঐ দাগ থেকে ডাণ্ডি দিয়ে চেংগিতে

জোরে আঘাত করতে হয়, দূরে পাঠানোর জন্য। ডাণ্ডি দিয়ে আঘাত করার পর ডাণ্ডিটি দাগের উপর রেখে দিতে হয়। অন্যপক্ষ চেংগির দিকে লক্ষ্য রাখে। চেংগিটি সোঁ সোঁ করে যাওয়ার পথে অন্যপক্ষের কেউ ছুঁয়ে দিতে পারলেই প্রতিপক্ষ দান হারায়। কিন্তু যদি ছুঁতে না পারে সে ক্ষেত্রে যে জায়গায় চেংগিটি পড়ে সেখান থেকে দাগ পর্যন্ত ডাণ্ডি দিয়ে মাপতে হয়। প্রত্যেক দশ ডাণ্ডিতে এক পয়েন্ট। যে দল বেশী পয়েন্ট পায় সে দল জয়ী হয়। এভাবে পয়েন্টের ভিত্তিতে খেলার জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়। এইভাবে খেলাটি দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে।

পর্যবেক্ষণ ঃ খেলাটি মূলতঃ ধর্মীয় উৎসব কেন্দ্রিক। এই খেলায় হাতের পেশী শক্তি, সমন্বয়, প্রতিক্রিয়ার সময় ও অনুমান ক্ষমতা বিশেষ প্রয়োজন। 'ডাণ্ডি' দিয়ে 'চেংগি'তে জোরে আঘাত করে দূরে পাঠানোর ক্ষেত্রে পেশী শক্তি ও প্রতিক্রিয়ার সময় উন্নত মানের হওয়া প্রয়োজন। চেংগিটি সোঁ সোঁ শব্দে যাওয়ার সময় ছুঁয়ে দেওয়ার মধ্যে অনুমান ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। হাত ও চোখের সমন্বয় এই খেলার একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

সামাজিক উৎসব কেন্দ্রিক খেলা ঃ

(ক) খেলার নাম	ঃ	**বর ও কনের জুয়া খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	সদ্য বিবাহিত বর ও কনে
সংখ্যা	ঃ	২ জন
উপকরণ	ঃ	একুশটি কড়ি, একটি মাটির প্রদীপ ও একটি কাঁসার থালা
খেলার সময়	ঃ	বিবাহের রাত্রি
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর

খেলার পদ্ধতি ঃ

[illegible]

মাটির প্রদীপের মধ্যে ২১টি কড়ি রাখে। তারপর কড়িগুলিকে একটি কাঁসার থালার মধ্যে ফেলে। কড়িগুলি ফেলার পর যে সমস্ত কড়ি উপুড় হয়ে পড়ে, সেগুলি বাদ যায়। কিন্তু যে কড়িগুলি চিৎ হয়ে পড়ে সেগুলিকে গণনা করা হয়। এরপর কনের হাতে মাটির প্রদীপ দেওয়া হয়। এই প্রদীপের মধ্যেও ২১টি কড়ি থাকে। বরের মত কনেও কাঁসার থালার মধ্যে কড়িগুলি ফেলে। পূর্বের গণনার নিয়ম অনুসারেই কনের কড়িগুলিকেও গণনা করা হয়। দুজনের চিৎ হওয়া কড়ির সংখ্যা গণনা করে জয় পরাজয় নির্দিষ্ট করা হয়। যার চিৎ হওয়া কড়ির সংখ্যা বেশী সে জয়ী হয়।

পর্যবেক্ষণ ঃ বর কনের জুয়া খেলা ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক খেলা। বিশেষ করে মালদা জেলায় বসবাসকারী রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচলিত। এই সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যগত ধারায় খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সম্ভবতঃ এই খেলা

অপরিচিত বর ও কনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রাথমিক অনুশীলন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক এই খেলার ধর্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্য উল্লেখযোগ্য।

(খ) খেলার নাম	ঃ	**কড়ি খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	বর ও কনে, বর্তমানে যে কেউ অংশগ্রহণ করে
সংখ্যা	ঃ	২ জন, অন্য সময় দুয়ের অধিক
উপকরণ	ঃ	চারটি কড়ি
খেলার সময়	ঃ	বিবাহের রাত্রি, এছাড়া দিনের যে কোন সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

কড়ি খেলাটি সাধারণ ভাবে উৎসব কেন্দ্রিক। বিশেষ করে হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানে এই খেলার বহুল প্রচলন দেখা যায়। ৪টি কড়ি নিয়ে খেলাটি বর্তমানে শুধুমাত্র বাসর ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বিভিন্ন বয়সী ছেলে মেয়েরা যে কোন স্থানে এখন এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। খেলোয়াড়রা নির্দিষ্ট স্থানে বসে এই খেলা খেলে। প্রথমে একজন চারটি কড়ি একসঙ্গে মাটিতে ফেলে। যদি ৪টি কড়ি-ই উপুড় হয়ে পড়ে তবে খেলোয়াড়ের 'চার' পয়েন্ট হয়। আবার যদি ৪টি কড়ি-ই চিৎ হয়ে পড়ে তবে 'ষোল' পয়েন্ট হয়। কড়িগুলি চিৎ হয়ে পড়লে খেলোয়াড়দের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। একজনই চারটি কড়ি কাড়াকাড়ি করে পেলে 'ষোল' পয়েন্ট পায়। যদি একটি কড়ি পায় তবে 'চার' পয়েন্ট হয়। অর্থাৎ চিৎ হওয়া প্রতিটি কড়ির পয়েন্ট চার। খেলোয়াড় চারটি কড়িকেই উপুড় করে না ফেলতে পারলে বা চিৎ হওয়া চারটি কড়ির মধ্যে কাড়াকাড়ি করে একটিও না পেলে খেলা শুরু করতে পারে না। যে চারটি কড়ি উপুড় করতে পাবে বা চিৎ হওয়া কড়ি পায় সে খেলা শুরু করতে পারে। চারটি কড়িই মাটিতে ফেলা হয়। এবার কড়ি চারটিকে দুটি দুটি ভাগে ভাগ করে নেয়। অর্থাৎ একটি কড়ি দিয়ে আর একটি কড়িকে মারে। লাগাতে পারলে 'এক' পয়েন্ট। দ্বিতীয় কড়ি দিয়ে অনুরূপভাবে আর একটি কড়িকে মারে। লাগাতে পারলে এক্ষেত্রেও এক পয়েন্টই পায়। এবার দুটো কড়ি দিয়ে বাকি দুটি কড়িকে যদি লাগাতে না পারে বা একটি কড়ি আর একটি কড়ির একদম গায়ে যদি লেগে যায় তবে সে দান হারায়। এই ভাবে খেলোয়াড়দের মধ্যে যে সবার আগে জয়ের জন্য নির্দিষ্ট পয়েন্ট অর্জন করে সে জয়ী হয় এবং পর্যায়ক্রমে বাকিরা। একজন চোর হয়। এবার চোরকে সবাই পর্যায়ক্রমে শাস্তি দেয়। শাস্তি দেবার পদ্ধতি হল — চারটি কড়িই জয়ী খেলোয়াড় তার হাতের মধ্যে নেয়। এবার চোরের অলক্ষ্যে মুষ্টিবদ্ধ করে চোরকে বলে - তার হাতে কটি কড়ি আছে? যদি ঠিক বলতে পারে তবে সেই কড়িগুলি চোরের হয়। আর যদি বলতে না পারে তবে সেই সংখ্যা হিসাব করা হয়। এই ভাবে হিসাব করে যতটি কড়ি হয় ততটি 'কিল' চোরকে মারা হয়। এ ভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি সমন্বয়, অনুমান ক্ষমতা ও দৃষ্টি শক্তি নির্ভর। আঙ্গুলের সাহায্যে

একটি কড়ি থেকে আর একটি কড়িকে আঘাত করার ক্ষেত্রে সমন্বয়, অনুমান ক্ষমতা ও প্রখর দৃষ্টিশক্তির বিশেষ প্রয়োজন। অন্যদিকে বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কড়ি খেলার মধ্যে বর ও কনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রাথমিক ধাপ বলা যেতে পারে।

সংযোজন ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে কড়ি খেলা বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। কারণ হিসাবে ড. অসীম দাস বলেছেন — "বরকে বরণ করার সময় মুগডাল, আতপচাল, মাটির ভাঁড় ইত্যাদির সঙ্গে পান ও কড়ি লাগে। ছাদনাতলাতেও ধান, দূর্ব্বা, লালসুতোর সঙ্গে কড়ির প্রয়োজন হয়। বর বাসি বিয়ের সময় নকল পুকুর থেকে সাতটি কড়ি খুঁজে বের করে আচার পালন করে। কোথাও একুশটি কড়ি নিয়ে খেলা করে বর কনে। শয্যাতুলুনির সময়েও পাঁচটা পয়সা, পাঁচটা সুপুরি, খই এবং কড়ি ব্যবহৃত হয়। বিবাহের সঙ্গে কড়ির এই ঘনিষ্ঠতাই প্রমাণ করে প্রজননের সঙ্গে কড়ির কোনও একটি যোগাযোগ কল্পনা করেছিল আদিম মানুষ। সম্ভবতঃ কড়ির নিজস্ব আকৃতিটিই এমন কল্পনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল আদিম মানুষকে। কড়ির সঙ্গে নারীর জননাঙ্গের অবিকল আকৃতিগত আনুরূপ্যের ফলেই এমনটা

মহড়া ভেদে ঃ—

অনুকৃতি লোকক্রীড়ার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই অনুকৃতি কখনো সমাজ জীবনকে, কখনো আরণ্যক জীবনকে, কখনো অতীত জীবনকে কেন্দ্র করে পরিলক্ষিত হয়। অন্য দিকে লোকক্রীড়ার জগতে ছড়ার আধিপত্যও উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ে। এই ছড়া গুলির মধ্যে সমাজ জীবনের এবং শিশু মনের অনেক স্বতঃস্ফূর্ত ছবি ফুটে ওঠে। অর্থাৎ দুটি ক্ষেত্রেই অনুশীলনের বা মহড়ার বিশেষ প্রয়োজন। এই বিষয়টি অনুধাবন করে বর্তমান গ্রন্থে মহড়া ভেদে একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। যার মধ্যে অভিনয় ধর্মী এবং ছড়া ধর্মী লোকক্রীড়া গুলি তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে অভিনয় ধর্মী ও ছড়া ধর্মী কিছু লোকক্রীড়া লিপিবদ্ধ করা হল —

অভিনয় ধর্মী ঃ

(ক) খেলার নাম	ঃ	**কুমির কুমির**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালক বালিকা
সংখ্যা	ঃ	৬-৭ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই লোকক্রীড়াটি বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই জনপ্রিয়। খেলাটিতে বালক বালিকা উভয়ই অংশগ্রহণ করতে পারে। খেলাটি অভিনয় ধর্মী। একজন কুমিরের ভূমিকায় এবং বাকিরা মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করে। খেলার স্থানটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাকে ডাঙা এবং অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গাকে জল বলে কল্পনা করা হয়। এই খেলায় একজনকে চোর নির্বাচন করা হয়। এই চোর কুমিরের ভূমিকায় অভিনয় করে। কুমির খেলার স্থানের নীচু জায়গায় যাকে জল বলে কল্পনা করা হয় সেখানে দাঁড়ায়। আর বাকিরা দাঁড়ায় উঁচু জায়গায় যাকে ডাঙ্গা বলে। ডাঙ্গায় দাঁড়ানো খেলোয়াড়রা সমবেত ভাবে বলে ওঠে 'কুমির কুমির তোমার জলে নেমেছি।' জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে কুমির স্থির থেকে হঠাৎ কোন খেলোয়াড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে সে কুমির হয় এবং কুমির মানুষ হয়। এ ভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ অভিনয় ধর্মী। খেলাটি ক্ষিপ্রতা, প্রতিক্রিয়ার সময়, অনুমান ক্ষমতা ও সমন্বয় নির্ভর। খেলাটিতে খেলোয়াড়ের সার্বিক শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন লক্ষ্য করা যায়।

সংযোজন ঃ অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত খেলাটি প্রসঙ্গে বলেছেন, "আরণ্যক জীবনের স্মৃতিকণা জড়ো হয়ে আছে 'কুমির কুমির' খেলার মধ্যে। 'কুমির তোমার জলে নেমেছি' - এ তো শত্রু শ্বাপদ সঙ্কুল নদী অরণ্যের প্রতিবেশী মানুষের জীবন যাপনেরই প্রতিভাস বাহী।"[৩]

(খ) খেলার নাম	ঃ	**এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	৭-১২ বছরের বালক বালিকা
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৫-৬ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর ও. অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় খেলা। সাধারণতঃ ছোট বালক-বালিকারা এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। খেলাটি অভিনয় ধর্মী। একদল খেলোয়াড় ছাগলের এবং একজন বাঘের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে। খেলা শুরুর আগে একজনকে চোর নির্বাচন করা হয়, খেলায় যার চরিত্র 'বাঘ'। বাকি খেলোয়াড়রা একটি বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করে, যারা 'ছাগল' বলে চিহ্নিত। খেলার শুরুতে বাঘ কাঁদতে কাঁদতে বৃত্তের বাইরে ঘুরতে থাকে। ছাগলেরা কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করে। শুরু হয় ছড়ার সংলাপ।

বাঘ	-	এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা (কান্নার সুরে)
ছাগদল	-	কি হইছে? (সমস্বরে)
বাঘ	-	গরু হারাইছে
ছাগদল	-	কি গরু?

বাঘ - লাল ধলো, মুখ কালো
আতের (রাতের) বেলা দেখবার ভাল।

'ভাল' বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ বৃত্তের মধ্যে লাফ দিয়ে একটি ছাগলকে ধরে এবং তাকে টেনে বৃত্তের বাইরে আনার চেষ্টা করে। ছাগদল এতে বাঁধা দেয়। বৃত্তের বাইরে আনতে পারলেই সে বাঘের দলভুক্ত হয়। এ ভাবে সবাইকে বাঘ বৃত্তের বাইরে টেনে আনে। শেষ ব্যক্তি যে ঘরে থাকে সে পরের দানে বাঘ হয়। এ ভাবে খেলাটি দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি মূলতঃ হাতের পেশী শক্তি, সমন্বয় ও শারীরিক সক্ষমতা নির্ভর। বাঘ-এর লাফ দিয়ে ছাগলকে বৃত্তের বাইরে আনার ক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতা ও পেশী শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। ছাগল রূপী খেলোয়াড়দের দ্রুত এবং ঠিক জায়গায় ধরার ক্ষেত্রে সমন্বয়েরও প্রয়োজন।

সংযোজন ঃ খেলাটি প্রসঙ্গে ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন, "আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অভিনয়ে এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা খেলায় প্রথমাংশ বাকসর্বস্ব কিন্তু এর দ্বিতীয়াংশে শক্তির পরীক্ষা আছে। এতে বাঘ ছাগলের অভিনয়ে ছদ্ম-শিকারের ছবি আছে। চিক্কায় আছে যুদ্ধের রীতি, এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গায় আছে শিকারের রীতি। এদিক থেকে এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা খেলাটি চিক্কা থেকেও প্রাচীন হতে পারে। কারণ সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে শিকারোপজীবিকা আদিমতম স্তর ছিল।"[১]

(গ) খেলার নাম	ঃ **কুকুর ও শকুনি খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ ৭-১০ বছরের বালক বালিকা
সংখ্যা	ঃ ৪-৫ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি বাংলার একটি অতি জনপ্রিয় লোকক্রীড়া। সাধারণতঃ ছোট বালক বালিকারা খেলাটিতে অংশগ্রহণ করে। খেলাটি অভিনয় ধর্মী। একজন কুকুরের ভূমিকায় এবং বাকিরা শকুনের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে। একটি মাঠের মধ্যে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। কুকুর মরার মত পড়ে থাকে, আর শকুনীরূপী খেলোয়াড়রা আকাশে ওড়ার মত ডানা মেলে তার চতুর্দিকে ভীড় করে। হঠাৎ মরার মত পড়ে থাকা কুকুরটি জেগে ওঠে এবং শকুনীদের তাড়া করতে শুরু করে। শুরু হয় দৌড়াদৌড়ি। শকুনীরা কুকুরের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে আর কুকুর তাদের স্পর্শ করার চেষ্টা করে। কুকুর যদি কাউকে স্পর্শ করে তবে সে কুকুরে রূপান্তরিত হয়। এভাবে খেলাটি দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে চলতে থাকে।

খেলায় ব্যবহৃত প্রচলিত ছড়াটি নিম্নরূপ —

আমরা যত শকুনী
মরা দেখি যখনি
উইড়া পালাই তখুনি
শোঁ-শোঁ-শোঁ।

পর্যবেক্ষণ : খেলাটি ক্ষিপ্রতা, গতি, সমন্বয়, সহনশীল শক্তি ও শারীরিক সক্ষমতা নির্ভর। কুকুর-এর শকুনিদের দ্রুত তাড়া করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্ত গুণ গুলি চোখে পড়ে।

সংযোজন : অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী খেলাটি প্রসঙ্গে বলেছেন, "লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শকুনি ও কুকুর আসলে দুই কৌম গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে। কুকুর ও শকুনি খেলাটি আসলে দুই কৌম গোষ্ঠীর সংঘাতের অনুকৃতি। কুকুরের প্রতিনিধি কুকুর টোটেমে বিশ্বাসী, শকুনি শকুন টোটেমে বিশ্বাসী দুই পৃথক মানবগোষ্ঠী। শকুনরূপী খেলোয়াড়রা যে শকুনের মত ওড়ার অভিনয় করেছে তা আসলে আদিম কোনো টোটেম গোষ্ঠীর যাদুনৃত্য।

আদিম মানব সমাজের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রথা হচ্ছে শিকারে বা যুদ্ধে যাবার পূর্বে তারা তাদের টোটেমের মত করে নিজেদের সাজিয়ে সেই টোটেম-পশু বা পাখির অনুকরণে নৃত্য করত। যারা এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করত তাদেরই যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক বলে ধরে নেওয়া হত। কৌম সমাজে বেশ কয়েক ধরনের নৃত্য প্রচলিত ছিল, রণ নৃত্য তাদের মধ্যে একটি। ..... কুকুর শকুনি ক্রীড়াতেও আসলে শকুনী গোষ্ঠীর নরগোষ্ঠী যুদ্ধের পূর্বে তাদের সেই টোটেম নৃত্য করছে।"[৫]

(ঘ) খেলার নাম	:	**ছি-ছত্তর খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	:	১০-১২ বছরের বালক বালিকা
সংখ্যা	:	৪-৬ জন বা ততোধিক
উপকরণ	:	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	:	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	:	দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি :

এই খেলাটি বাংলার একটি অতি জনপ্রিয় লোকক্রীড়া। ছোটছোট বালক বালিকারা সাধারণতঃ এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। খেলাটি অভিনয় ধর্মী। একজন 'চিল' ও বাকিরা 'মোরগ' এর ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে। একটি বৃত্ত তৈরী করা হয়। বৃত্তের মাঝখানে থাকে চিল এবং বৃত্তের বাইরে পরস্পরের হাত ধরে বৃত্তাকারে থাকে মোরগরা। চিল সবসময় চেষ্টা করে বৃত্ত ভেঙে বাইরে আসতে। মোরগরা বাঁধা দেয়। মোরগদের হাত শিথিল করতে এবং অন্যমনস্ক করতে চিল ছড়া আবৃত্তি করতে থাকে। ছড়ায় বীরত্ব প্রকাশিত হয় —

ছি ছাই ঘোড়া দাবড়াই

ঘোড়া না ঘুড়ি চাবুক ছড়ি।।
চাবুক দিয়া মারলাম বাড়ি।
ধূলা ওঠে গাড়ি গাড়ি।।

মোরগরা একটু অন্যমনস্ক হলেই চিল বৃত্তের বাইরে ছুটে পালায়। মোরগরা তাকে ছোঁয়ার জন্য ছুটতে থাকে এবং বীরত্বের ছড়া আবৃত্তি করতে থাকে —

ছি ছত্তর কচুর বই
চ্যাংড়া প্যাংড়ার নানা হই।
টাকের উপর আয়না
পুঁটি মাছ খায় না।
টাকের উপর গোস্ত
ছোঁয়া দিলে দোস্ত।

চিলকে স্পর্শ করতে পারলে আবার নতুন করে খেলা শুরু হয় এবং অন্য আর একজন চিল হয়। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ খেলাটি পেশী শক্তি, ক্ষিপ্রতা, গতি ও সমন্বয় নির্ভর। বৃত্ত ভেঙে চিল -এর বাইরে আসার ক্ষেত্রে ও বৃত্তের বাইরে ছুটে পালানোর ক্ষেত্রে পেশী শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও গতির বিশেষ প্রয়োজন। মোরগদের অন্যমনস্ক করার ক্ষেত্রে কৌশলগুনও এই খেলার একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

ছড়া ধর্মী খেলা ঃ

(ঘ) খেলার নাম	ঃ	**এলাটিং-বেলাটিং**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালিকা
সংখ্যা	ঃ	উভয় পক্ষে ন্যুনতম ৫-৭ জন করে
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর সহ প্রায় সমস্ত জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি মূলতঃ মেয়েদের। খেলোয়াড় বিভাজনের যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে খেলোয়াড়রা দু'দলে বিভক্ত হয়। খেলা শুরুর আগে খেলার স্থানে একটি সরলরেখা আঁকা হয়। এবার খেলোয়াড়রা সরলরেখার দুদিকে সরলরেখা থেকে সমান দূরত্বে পরস্পর পরস্পরের দিকে মুখ করে নিজেদের খেলোয়াড়দের হাত ধরে দাঁড়ায়। এবার প্রথম পক্ষের খেলোয়াড়রা হাত ধরাধরি করে সরলরেখা পর্যন্ত এগিয়ে এসে বলে 'এলাটিং বেলাটিং সৈলো'। এই কথাটি বলেই তারা পিছিয়ে যায়। দ্বিতীয়পক্ষ তখন একই ভাবে সরলরেখার কাছে এসে বলে 'কি খবর আইল'? কথাটি বলেই তারাও পিছিয়ে যায়। আবার প্রথমপক্ষ

একই ভাবে সরলরেখার কাছে এসে বলে 'রাজা একটি সোনার বালিকা চাইল'। এই ভাবে ছড়ার মধ্য দিয়ে দুদলের কথোপকথন চলতে থাকে। সবশেষে দ্বিতীয় পক্ষ একজন বালিকাকে প্রথম পক্ষকে দিয়ে দেয়। দিয়ে দেবার সময় দুই পক্ষের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয় এবং প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কাছ থেকে নির্দিষ্ট বালিকাকে ছিনিয়ে নেয়। এই ভাবে ক্রীড়াটির একটি দান শেষ হয়। দ্বিতীয় দানে ঠিক বিপরীত ভূমিকায় দুই পক্ষ অবতীর্ণ হয়। খেলায় ব্যবহৃত ছড়াটি নিম্নরূপ —

১ম পক্ষ - এলাটিং বেলাটিং সৈ লো।
২য় পক্ষ - কি খবর আইল?
১ম পক্ষ - রাজা একটি সোনার বালিকা চাইল।
২য় পক্ষ - কোন বালিকা চাইল?
১ম পক্ষ - অমুক (নির্দিষ্ট নাম) বালিকা চাইল।
২য় পক্ষ - কি পরে যাবে?
১ম পক্ষ - বেনারসী পরে যাবে?
২য় পক্ষ - কিসে করে যাবে?
১ম পক্ষ - পাল্কি করে যাবে।
২য় পক্ষ - কত টাকা দেবে?
১ম পক্ষ - হাজার টাকা দেবে।
২য় পক্ষ - নিয়ে যাও নিয়ে যাও বালিকাকে।

আধুনিক কালে ছড়াটি অনেক জায়গায় নিম্নরূপ —

২য় পক্ষ - কি পরে যাবে?
১ম পক্ষ - ম্যাক্সি পরে যাবে।
২য় পক্ষ - কিসে করে যাবে?
১ম পক্ষ - ট্যাক্সি করে যাবে।

পর্যবেক্ষণ ঃ খেলাটি মূলতঃ পেশী শক্তি নির্ভর। এক পক্ষের বালিকাকে অন্য পক্ষ ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে পেশী শক্তি ও সার্বিক সমন্বয় বিশেষ প্রয়োজন।

সংযোজন ঃ ক্রীড়ার ছড়াটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন "সমাজের একদিনের একটি সকরুণ ঘটনা কালক্রমে যে কি ভাবে খেলায় পরিণত হইয়াছে, তাহা এখানে দেখা যাইতেছে।"[৩]

ড. অসীম দাস এই খেলাটি প্রসঙ্গে বলেছেন, "বাংলা দেশে সমগ্র মধ্যযুগটি সাধারণ মানুষের চোখের জলের যুগে ছিল। এই যুগে দাস প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পর্তুগীজ দস্যুগণ গ্রামবাংলার মানুষের উপর প্রচণ্ড অত্যাচ্যার করত এবং নারী, পুরুষ ও শিশুদের বিদেশী দাসের হাটে বিক্রী করত।"[৪] এযুগ সম্পর্কে অতুল সুর বলেছেন,"সোনার

থালাবাসনের মতো দাস দাসীর সংখ্যাও ছিল সামাজিক মর্যাদার একটি মাপকাঠি। এ সব দাস দাসীর উপর গৃহপতিরই মালিকানা স্বত্ত্ব থাকত। গৃহপতির অধীনে থেকে তারা গৃহপতির জমিকর্ষণ ও গৃহস্থালির কাজকর্ম করত। কখনও কখনও মালিকরা তাদের দাসীগণকে উপপত্নী হিসাবেও ব্যবহার করত। নবাব সুলতান ও বাদশাদের হারেমে এরকম হাজার হাজার দাসী থাকত। সাধারণতঃ এ সকল দাসীদের হাট থেকে কেনা হত। অনেক সময় দামদস্তুর করে মুখের কথাতেই তাদের কেনা হত, তবে ক্ষেত্র বিশেষে দলিল পত্রও তৈরী করে নেওয়া হত।"[১০]

এই খেলাটির মধ্য দিয়ে সে যুগের দাসী ক্রয়ের বিষয়টিই প্রস্ফুটিত হয়েছে। একদা বাংলার অসহায় দরিদ্র নারীগণ কিভাবে বড় লোকদের লালসার স্বীকার হয়েছে ক্রীড়াটিতে তাই দেখানো হয়েছে।

(খ) খেলার নাম ঃ **ইকিড়-মিকিড়**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী ঃ ৮-১০ বছরের বালিকা
সংখ্যা ঃ দলবদ্ধ, ৬-৭ জন বা ততোধিক
উপকরণ ঃ উপকরণ বিহীন
খেলার সময় ঃ দিনের যে কোন সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি পশ্চিমবঙ্গের একটি জনপ্রিয় খেলা। খেলাটি ছেলে-মেয়ে উভয়েই একসঙ্গে খেলতে পারে। খেলার শুরুতে সবাই বৃত্তাকারে বসে এবং হাত দুটি উপুড় করে সামনে মাটির ওপর রাখে। এবার যে কোন একজন খেলোয়াড় তার একহাত ঐ ভাবে মাটিতে রেখে ডানদিক থেকে গণনা শুরু করে। যেখানে ছড়াটি শেষ হয় সেই আঙ্গুলটি মুড়ে দেওয়া হয়। এই ভাবে সবার সব আঙ্গুল গুলি মুড়ে গেলেও একজনের একটি আঙ্গুল বাদ থাকে। সে চোর বলে বিবেচিত হয়। এই খেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছড়াটি হল —

ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি-চাম-চিকড়ি
চামের কাটা মজুমদার
ধেয়ে এলো দামোদর
দামোদরের হাঁড়ি কুঁড়ি
দুয়ারে বসে চাউলকুঁড়ি।
চাউল কুঁড়তে হল বেলা
ভাত খাওসে দুপুর বেলা।
ভাতে পড়লো মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁছি।
কোদাল হল ভোঁতা,
খেঁকশিয়ালের মাথা।

পর্যবেক্ষণ ঃ খেলাটি মূলতঃ বিনোদন মূলক। খেলাটিতে ছড়া উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে অদ্ভুত সুরের আগমন ঘটে। তাছাড়া ছড়াটি মুখস্থ রাখার বিষয়টি এই খেলার একটি শিক্ষামূলক দিক।

সংযোজন ঃ খেলাটি প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন, "জাহাঙ্গীর মোগল সম্রাট হবার পর তিনি তাঁর সেনাপতি মানসিংহকে বাংলায় পাঠান বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করবার জন্য। মানসিংহ অসংখ্য সৈন্য ও হস্তী-অশ্ব নিয়ে জলঙ্গী নদী অতিক্রম করতে গিয়ে মহা সমস্যায় পড়েন। মানসিংহ যখন এই দারুণ সমস্যার সম্মুখীন, তখন 'ভবানন্দ সমাদ্দার' নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার প্রতিভাসম্পন্ন সুকুমার মুর্ত্তি দেখিয়া মানসিংহ মুগ্ধ হইলেন। বিশেষতঃ যখন কোন জমিদার তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন নাই, তখন সাহস করিয়া ভবানন্দ আসিলে এবং যে কোন ভাবে হউক বাদশাহী সৈন্যদলের সাহায্য করিতে চাহিলে মানসিংহ পরিতুষ্ট হইলেন। ভবানন্দ তখন হুগলীতে কানুনগো দপ্তরে মুহুরীগিরি করিতেন, তখনও তিনি কানুনগো হন নাই। চাকরী হিসাবে মুহুরীগিরি বিশেষ কিছু না হইলেও তখনকার দিনে ইহাতে পয়সা ছিল এবং পৈতৃক সম্পত্তি ও পূর্বতন আয় হইতেও ভবানন্দ সঙ্গতি সম্পন্ন ছিলেন। ..... দেশের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল ......। ভবানন্দ বিশেষ চেষ্টা করিয়া বহুসংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিলেন। বাদশাহী সৈন্য নিরুদ্বেগে পার হইল। ভবানন্দের এই বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলায় প্রতাপাদিত্যের নির্মম পারজয় বাদশাহী সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক সুচারু রূপে সম্পাদিত হয়। বাংলা মোগল শাসনের অধিকারে আসে।"[১১]

ডঃ অসীম দাস বলেছেন "ছড়াটি বহুতর রূপ প্রচলিত থাকলেও সর্বাধিক প্রচারিত ছড়ারূপগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই জনৈক 'চামে কাটা' বা 'চামকাটা' 'মজুমদারে'র পরিচয় পাওয়া যায়। 'চামেকাটা' বা 'চামকাটা' বলতে নিশ্চয়ই 'নির্লজ্জ' বলতে চাওয়া হয়েছে। নির্লজ্জ মানুষকে আমরা 'চোখের চামড়া নেই' বলতে অভ্যস্ত। আর এক অর্থও করা যায়। হয়তো এই নির্লজ্জ মজুমদার অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন, কারণ কোন কোন ছড়ায় দেখা যায় 'চাম কাটে মজুমদার'। এই মজুমদারকে চামচিকে বলে বিদ্রুপ করা হয়েছে, বলা হয়েছে 'ইকির মিকির চামচিকির'।

বাংলাদেশে সম্ভবত এমন কোন মজুমদারের অস্তিত্ব ছিল যিনি তাঁর নির্লজ্জ ক্রিয়াকলাপ এবং নিষ্ঠুর আচরণের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রভাবও নিশ্চয়ই বহুব্যাপ্ত ছিল, সেই কারণেই সারা বাংলাদেশ জুড়ে তাঁর এই অপকীর্তিজনিত নিন্দাবাণী ছড়িয়ে পড়েছিল মুখে মুখে। এই মজুমদার মশায়কে চিহ্নিত করতে পারলেই ছড়াটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।"[৪]

(গ) খেলার নাম	ঃ	**আগডুম-বাগডুম**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১২ বছরের বালক বালিকা
সংখ্যা	ঃ	নির্দিষ্ট নয়, ৫-৬ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন

খেলার সময় ঃ দিনের যে কোন সময়
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল ঃ নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলী ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি মূলতঃ অবসর বিনোদনের খেলা। ঘরের বিস্তৃত মেঝেতে খেলোয়াড়রা চক্রাকারে বসে এই খেলা খেলে। খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে একজন দলপতি হয় যে ছড়াটির এক একটি শব্দ উচ্চারণ করে। দলপতি, খেলা শুরু হলে ছড়ার এক একটি শব্দ উচ্চারণান্তে এক এক জনের হাঁটু স্পর্শ করে খেলা পরিচালনা করে। হাঁটু স্পর্শ করার সময় সমস্ত খেলোয়াড় বিশেষ দৃষ্টি রাখে যাতে কাউকে এড়িয়ে যেতে না পারে এবং নিজেদের হাঁটু দুটিকে স্পর্শ থেকে বাদ দেওয়া না হয়। ছড়ার শেষ শব্দটি যার হাঁটুতে এসে শেষ হয়, সে নিজের হাঁটুটি গুটিয়ে রাখে। ছড়াটি নিম্নরূপ —

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক ঢোল ঝাঁঝর বাজে।।
বাজতে বাজতে চললো ঢুলি।
ঢুলি গেল কমলা ফুলি।
কমলা ফুলির টিয়েটা।
সূর্যি মামার বিয়েটা।।
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
পান সুপারি কিনে খাই।।
একটা পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।।
কচি কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে খুকু গা তোল।।
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
তারার নামে টগর ফুল।।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি একান্তভাবে বিনোদনমূলক। ছড়া বলার পারদর্শিতা এবং ছড়াটি মুখস্থ রাখার শিক্ষামূলক দিকটিও লক্ষ্যণীয়।

সংযোজন ঃ এ ক্রীড়াটি একটি বিবাহ যাত্রার বর্ণাঢ্য পরিচয় সম্বলিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে — এই ছত্রটির কোন পরিষ্কার অর্থ আছে কিনা জানিনা, অথবা যদি ইহা অন্য কোন ছত্রের অপভ্রংশ হয় তবে সে ছত্রটি কি ছিল তাহাও অনুমান করা সহজ নহে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রথম কয়েক ছত্র বিবাহ যাত্রার বর্ণনা।"[১২]

ড. অসীম দাস বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের অনুমানই সত্য। এক সময় কন্যাকে হরণ করে এনে অথবা জয় করে এনে বিবাহ করতে হত পাত্র পক্ষকে। তারই স্মৃতি হিসাবে বিবাহ আচারের মধ্যে প্রায়ই নকল যুদ্ধের মহড়া লক্ষ্য করা যায়। এখানেও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটেছে।"[৪] এ খেলার উৎপত্তি ও নামকরণ সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "আগডুম অর্থ অগ্রবর্তী ডোম সৈন্যদল, বাগডুম অর্থাৎ বাগ বা পার্শ্বরক্ষী ডোম সৈন্যদল এবং ঘোড়াডুম অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোম সৈন্য।"[৫] ডোম সৈন্যদল কেন? এর উত্তরে তিনি বলেছেন, "একদিন ডোম সৈন্যই বাংলার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করিত। বিষ্ণুপুর, রাজনগর, প্রভৃতি স্থানের সামন্ত রাজগণ ডোম সৈন্যদল রক্ষা করিতেন। মধ্যযুগের বাংলার লৌকিক সাহিত্য তাহাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনীতে পরিপূর্ণ।"[৬] সুতরাং এই খেলাটির মধ্য দিয়ে ডোম সৈন্যদের প্রভাব প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

(ঘ) খেলার নাম	ঃ	**টুনটুনি পাখি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১২ বছরের বালিকা
সংখ্যা	ঃ	৫-৬ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও অন্যান্য জেলা

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি 'চোর' নির্বাচনের যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে একজনকে চোর নির্বাচন করা হয়। এবার 'চোর' হামাগুড়ি দেওয়ার মত অবস্থায় থাকে। বাকি খেলোয়াড়রা তার উপর দিয়ে লাফ দেয় এবং লাফ দেওয়ার সময় উচ্চারণ করে —

টুনটুনি পাখী নাচতো দেখি (প্রথম লাফ)
না বাবা-নাচবো না / পড়ে গেলে বাঁচবো না (দ্বিতীয় লাফ)
পড়েছি বেশ করেছি / পিছন দিকে হাত করেছি (তৃতীয় লাফ)
হাতির মাথায় সোনার ছাতা / টুনটুনি খায় ব্যাঙের মাথা (শেষ লাফ)

ছড়া সহ লাফ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'চু' ধ্বনি দিতে দিতে এক পা তুলে সমস্ত খেলোয়াড় টুনটুনির চারপাশে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে কোন খেলোয়াড় দম ছেড়ে দিলে বা পা মাটিতে ফেললে সে 'চোর' নির্বাচিত হয়। এই ভাবে খেলাটি দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ খেলাটি পেশী শক্তি, বিস্ফোরক শক্তি, দম ও ভারসাম্য নির্ভর। চোরের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র পেশী শক্তি ও বিস্ফোরক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। এক পা তুলে 'চু' ধ্বনি দিতে দিতে টুনটুনির চারপাশে ঘোরার ক্ষেত্রে দম ও ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

শরীরচর্চা ভেদে ঃ—

নিয়মিত শরীর চর্চার মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। আর এই শরীর চর্চার যে সমস্ত মাধ্যম আছে খেলাধূলা সেগুলির মধ্যে অন্যতম। খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে শরীর চর্চা ও অবসর বিনোদন দুই-ই হয়। লোকক্রীড়া এই দুটি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কিছু লোকক্রীড়া বেশী পরিশ্রম যুক্ত হওয়ায় শরীর চর্চার উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশী। অন্যদিকে কিছু লোকক্রীড়ায় পরিশ্রম না থাকলেও অবসর বিনোদনের উপাদানে সমৃদ্ধ। স্বভাবতঃই বর্তমান গ্রন্থে শরীর চর্চা ভেদে লোকক্রীড়াগুলির শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। অধিক পরিশ্রমযুক্ত লোকক্রীড়াগুলিকে শ্রম সাপেক্ষ এবং মূলতঃ বিনোদনমূলক লোকক্রীড়াগুলিকে শ্রমহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে শ্রম সাপেক্ষ কিছু লোকক্রীড়া লিপিবদ্ধ করা হল—

শ্রম সাপেক্ষ খেলা ঃ

(ক) খেলার নাম	ঃ	**গাদি খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালক-বালিকা
সংখ্যা	ঃ	নির্দিষ্ট, সরলরেখা সমসংখ্যক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	নুনতা, দাঁড়িয়াবান্ধা, গাদল, বদনঘর, চিকে খেলা, নুন দাঁড়িয়া, গজ্জি খেলা ইত্যাদি

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি বাংলার একটি অতি জনপ্রিয় খেলা। সারা বাংলায় খেলাটি বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। খেলোয়াড় বিভাজনের যে কোন পদ্ধতি অনুসারে খেলোয়াড়রা সমসংখ্যক দুটি দলে বিভক্ত হয়। একটি আয়তক্ষেত্রকে লম্বালম্বি এবং আড়াআড়ি ভাবে সরলরেখার দ্বারা সম আয়তনের কয়েকটি ঘরে বিভক্ত করা হয়। সরলরেখার সংখ্যার উপর নির্ভর করে খেলোয়াড় সংখ্যা। অর্থাৎ লম্বা লম্বি একটি সরলরেখার জন্য একজন এবং আড়াআড়ি সরলরেখার প্রত্যেকটির জন্য একজন করে। মোট ৬টি সরলরেখা থাকলে ৬ জন খেলোয়াড় একটি দলে থাকবে। এই খেলায় একদল খেলোয়াড় সর্বপ্রথম একটি ঘরে সমবেত হয়। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা বিভাজক রেখাগুলির উপর দাঁড়ায় পাহারাদার হিসাবে। এবার ঘরের খেলোয়াড়রা দাগে দাঁড়ানো খেলোয়াড়দের ছোঁয়া বাঁচিয়ে একঘর থেকে অন্যঘরে যেতে চেষ্টা করে এবং পাহারাদাররা দাগে দাঁড়িয়ে তাদের ছুঁতে চেষ্টা করে। যে ঘর থেকে খেলা শুরু হয় তার পাশের ঘরটির নাম 'নুনঘর'। পলায়নকারী খেলোয়াড়দের লক্ষ্য হল যে ঘর থেকে রওনা দিয়েছিল সমস্ত ঘর পরিক্রমা করে সেই ঘরে পৌছানো। এই খেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নুনঘরে প্রবেশ করতেই হবে। নুন ঘরে

প্রবেশ করাকে বলে 'নুন' নেওযা। এবার পলায়নকারী খেলোয়াড়দের যে কোন একজন যদি নুন নিয়ে সমস্ত ঘর পরিক্রমা করে যে ঘর থেকে খেলা শুরু হয়েছিল সেই ঘরে পৌঁছাতে পারে তবে গোটা দলটিরই জয় হয়। এক 'গাদি' বলে। আর পাহারাদাররা যদি বিপক্ষদলের একজনকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে গোটা দলটিই মোর হয়। তখন পাহারাদাররা পলায়নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। গাদির সংখ্যা যাদের বেশী তারাই জয়ী হয়।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি গতি, ক্ষিপ্রতা, প্রতিবর্ত ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়ার সময়, অনুমান ক্ষমতা ও ভারসাম্য নির্ভর। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের ছোঁয়া বাঁচিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার ক্ষেত্রে, খুব দ্রুত বিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এবং খেলার নির্দিষ্ট দাগের বাইরে না যাওয়ার ক্ষেত্রে গতি, ক্ষিপ্রতা, প্রতিবর্ত ক্রিয়া, অনুমান ক্ষমতা ও ভারসাম্যের বিশেষ প্রয়োজন। সার্বিক সক্ষমতা যুক্ত খেলোয়াড়রা এই খেলায় পারদর্শী হয়।

সংযোজন ঃ এই খেলাটি প্রসঙ্গে মাযহারুল ইসলাম তরু বলেছেন, "গাদি খেলাটি ঠিক যেন যুদ্ধের মতো, শত্রুর ব্যূহভেদ করে সফলতা অর্জনের কঠিন পরীক্ষা এতে নিহিত। সীমিত স্থানে ছুটোছুটি করে প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দেবার জন্য প্রান্তরেখা দিয়ে লাফিয়ে একটি কোর্টে ডিঙ্গানোতে সমস্ত অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হয়। একজনের ভুলে সমগ্র দলকে তার খেসারত দিতে হয়। তাই প্রত্যেকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সমান। তা পালনে ব্যর্থ হলে পরাজয় অনিবার্য।"[৩]

ড. অসীম দাস খেলাটিকে 'অশ্রুসিক্ত লবণের স্বাদ' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, "লবনের চোরা কারবারকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে গাদি খেলা। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশীয় লবণের কারবার একচেটিয়া ভাবে ইংরেজ নিজেদের হাতে নেয়। এর ফলে বাংলার ব্যবসায়ীরা চরম দুর্দশার মধ্যে পড়েন। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে তাদের চুরি বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই খেলাটির উৎপত্তি। গাদি খেলায় একটি ঘরের নাম 'নুনঘর'। পলায়নপর খেলোয়াড়গণই হচ্ছে লবণের চোরাকারবারী। লবণ উৎপাদনের ঘরে প্রবেশ না করলে লবণ হাতে পাওয়া যাবে না। তাই গাদি খেলায় পলায়নপর খেলেয়াড়গণের 'নুনঘরে' প্রবেশ করাটা আবশ্যিক। আর নুনঘরে প্রবেশ করতে হত নিমক চৌকীর পাহারাসহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কঠোর পাহারাদারের দৃষ্টি এড়িয়ে। এই পাহারাদাররা হলো দাগে দাঁড়িয়ে থাকা খেলোয়াড়রা।"[৪]

(খ) খেলার নাম	ঃ	**বউছি**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১৫ বছরের বালিকা
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৫-৬ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	সকাল ও বিকেল বেলা

সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	বউবাসন্তি, বউকপাটি, বুড়িছুট, বুড়িচ্ছু, বউগোলা, চামচু, সীতাবুড়ি ইত্যাদি

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। খেলোয়াড়রা সমসংখ্যক দুটি দলে বিভক্ত হয়। আপসে ঠিক হয় কোন দল প্রথমে খেলার সুযোগ পাবে। এই খেলায় ২৫-৩০ হাত দূরত্বে দুটি ঘর কাটা হয়। একটি 'বউঘর', অন্যটি অপর খেলোয়াড়দের ঘর। বউঘর আকারে ছোট এবং গোলবৃত্ত। খেলোয়াড়দের ঘরটি আকারে বড় ও চতুষ্কোণ। খেলোয়াড়দের ঘরটিকে বলা হয় 'জুড়িঘর'। দলের মধ্যে সবথেকে চালাক এবং শক্ত সামর্থ খেলোয়াড়কে বউ বা বুড়ি করা হয়। বউ বা বুড়ি বিপক্ষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে 'বউঘর' থেকে 'জুড়িঘরে' পৌছাতে পারলে এক পয়েণ্ট হয়। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা 'বউঘর' থেকে বুড়ি যাতে 'জুড়িঘরে' যেতে না পারে তারজন্য উভয় ঘরকে সুবিধামত ভাবে ঘিরে রাখে। বুড়িকে ঘরের বাইরে স্পর্শ করা গেলে তারা দান পায়। একপক্ষ বুড়িকে সতর্কভাবে পাহারা দেয় আর বুড়িও তাদের এড়িয়ে সতর্কতার সঙ্গে নিজ ঘর থেকে 'বুড়িঘরে' আসার চেষ্টা করে। বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের সরিয়ে দিতে বা অন্যমনস্ক করে দিতে বুড়ির দলের একজন খেলোয়াড় শ্বাস রেখে জুড়ি ঘরের বাইরে এসে তাড়া করে। তাড়া করার সময় খেলোয়াড়ের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় — 'কাঁচ কলা পাকা আম, বউ ছুঁইতে গেছিলাম' বা 'চুক গাব না চৌরী গাব, পাতিনেবুর মাতি খাব' অথবা 'ছি বুড়ি খুনের খেলা, যখন তখন মাইর‍্যা ফেলা।' এই ভাবে ছড়া বলতে বলতে দম নিয়ে যাওয়াকে বলে 'ছি-দেওয়া'। ছি-দেওয়া অবস্থায় খেলোয়াড় বিপক্ষের কাউকে স্পর্শ করলে সে মোর হবে। আবার জুড়িঘরে আসার আগেই যদি খেলোয়াড় শ্বাস ছেড়ে দেয় এবং বিপক্ষের কেউ যদি ছুঁয়ে দেয় তবে সে মারা যায়। দম শেষ হলে খেলোয়াড় বুড়ির কাছে আশ্রয় নিতে পারে এবং বুড়ি দম দেওয়া অবস্থায় সে জুড়িঘরে ফিরে আসতে পারে। এই ভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি ক্ষিপ্রতা, গতি, দম, প্রতিক্রিয়ার সময় ও অনুমান ক্ষমতা নির্ভর। বিপক্ষের খেলোয়াড়দের 'ছি-দেওয়ার' সময় দ্রুত ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতা ও গতি, শ্বাস রেখে বিপক্ষকে তাড়া করার ক্ষেত্রে দম এবং ঠিক সময়ে বিপক্ষকে ছোঁয়ার ক্ষেত্রে অনুমান ক্ষমতা বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া বিপক্ষদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বউঘর থেকে জুড়িঘরে আসার ক্ষেত্রেও গতি, ক্ষিপ্রতা, প্রতিক্রিয়ার সময় ও অনুমান ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

সংযোজন ঃ এই খেলাটি প্রসঙ্গে শঙ্কর সেনগুপ্ত বলেছেন, "এ খেলায় বউকে ঘিরে বিপক্ষ দলের অবরোধ এবং স্বপক্ষের সহায়তায় সে অবরোধ ভেদ করে বউ-এর মুক্তি দেবার চেষ্টা দেখি। এর দ্বারা প্রাচীন হিন্দু বিবাহের কথা স্মরণ করতে পারি। এই ধরণের খেলা দেখে মনে হয় নারীর শ্লীলতা রক্ষার্থে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাঙালী নিজেদের সাহস,

ধৈর্য্য, সহ্যশক্তি ও বিক্রম প্রকাশের চেষ্টা করতেন এবং বিভিন্ন লোকক্রীড়ার মাধ্যমে তার মহড়া দিতেন।"[১৩]

ড. অসীম দাস বলেছেন, "কন্যা অপহরণের পর কন্যা পক্ষ এবং বরপক্ষের মধ্যে যে লড়াই সংঘটিত হত আদিম কালের অপরহরণমূলক প্রথার বিবাহের সময়ে, সেই যুদ্ধদৃশ্যটিই বহু সহস্র বৎসরের পথ অতিক্রম করে এসেও টিকে রয়েছে এই খেলার মধ্যে। এই খেলায় বর পক্ষের লোকেরা কন্যা পক্ষ থেকে কন্যা অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে নিজেদের এলাকায় আগলে রেখেছে, এবং কন্যা পক্ষের লোকেরা বর পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে কন্যাকে নিজেদের দখলে আনতে চেষ্টা করছে; এই চিত্রটি ক্রীড়াটিতে পরিষ্কার।"[১৪]

(গ) খেলার নাম	ঃ	**বাগড়ী খেলা**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	২৫-৩০ বছরের পুরুষ
সংখ্যা	ঃ	নির্দিষ্ট নয়, তবে ঊর্ধ্বে দুদলে ৮ জন করে
উপকরণ	ঃ	উপকরণ বিহীন
খেলার সময়	ঃ	দুপুর বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া

খেলার পদ্ধতি ঃ

এই খেলাটি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় খেলা। বর্তমানে খেলাটি প্রায় অবলুপ্ত। খেলাটি মূলতঃ শক্তি পরীক্ষার খেলা। মধ্যবয়সী বলশালী পুরুষেরা এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। খেলাটি কোন নদী বা খালের তীরে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ অঞ্চল ভেদে খেলোয়াড়েরা দুদলে বিভক্ত হয়। খেলা শুরুর আগে খেলোয়াড়রা সরষের তেল বা ঐ জাতীয় কিছু পিচ্ছিল পদার্থ গায়ে মেখে নেয়। খেলোয়াড়রা দু দলে বিভক্ত হয়ে দাঁড়ায়। দু দলের মাঝখানে একটি সরলরেখা টানা হয়। এবার 'ক' দলের জনৈক খেলোয়াড় 'খ' দলের উপর 'কিৎ কিৎ' ধ্বনি দিতে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যে কোন একজনকে নিজ দলে আনার চেষ্টা করে। অপর পক্ষে 'খ' দলের খেলোয়াড়রা সর্বশক্তি দিয়ে 'ক' দলের আক্রমণনকারীকে নিজ সীমানায় আটকে রাখার চেষ্টা করে। এই ভাবে 'ক' অথবা 'খ' দলের একজন মারা পড়ে। আক্রমণকারী নির্দিষ্ট রেখাটি স্পর্শ করতে পারলে মারা পড়বে না। এ ভাবে খেলাটি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ঃ এই খেলাটি বর্তমানে বহুল প্রচলিত 'কবাডি' নামক শিষ্টক্রীড়ার অনুরূপ। স্বভাবতঃই 'কবাডি' খেলার মধ্য দিয়ে মানুষের যে সমস্ত শরীর সঞ্চালক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে, এই লোকক্রীড়াটির মধ্য দিয়েও সেই গুণগুলি অনায়াসে বিকশিত হতে পারে। খেলাটি মূলতঃ শক্তি, সাহস, ক্ষিপ্রতা ও শ্বাস ধারণ ক্ষমতা নির্ভর। দীর্ঘক্ষণ ধরে খেলাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সার্বিক সক্ষমতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

(গ) খেলার নাম	ঃ	**গোল্লাছুট**
সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারী	ঃ	১০-১২ বছরের বালক-বালিকা
সংখ্যা	ঃ	দলবদ্ধ, ৬-৭ জন বা ততোধিক
উপকরণ	ঃ	একটি লাঠি
খেলার সময়	ঃ	বিকেল বেলা
সর্বাধিক প্রচলিত অঞ্চল	ঃ	নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণাসহ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা
অঞ্চল ভেদে নামের বিভিন্নতা	ঃ	চরকা খেলা, গোলাচ্ছুট, চিনি-বিস্কুট, গোল্লার সই ইত্যাদি

খেলার পদ্ধতি ঃ

'গোল্লাছুট' খেলাটি শুরু হয় খেলোয়াড় বিভাজনের যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে খেলাটি প্রচলিত এবং খেলার পদ্ধতিও প্রায় অভিন্ন। খেলোয়াড়দের সমান সংখ্যক দুটি দলে বিভক্ত করা হয়। প্রশস্ত যে কোন প্রাঙ্গণে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শুরুর পূর্বে ভূমির উপর একটি বড় বৃত্ত আঁকা হয় এবং সেই বৃত্তের মাঝখানে গর্ত করে একটি লাঠি সেই গর্তে সংস্থাপন করা হয়। এই গর্ত থেকে প্রায় ৩০-৪০ হাত দূরে সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়। এবার একদল খেলোয়াড় একজন বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত লাঠিটিকে ধরে থাকে এবং বাকি খেলোয়াড়রা সেই খেলোয়াড়ের হাত ধরে লম্বা শৃঙ্খল তৈরী করে। অন্যদিকে বিপরীত পক্ষের খেলোয়াডরা ৩০-৪০ হাত দূরের নির্দিষ্ট সীমানায় ছড়িয়ে দাঁড়ায়। শৃঙ্খলে আবদ্ধ খেলোয়াড়রা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে এবং ঘুরতে ঘুরতে এক এক করে শৃঙ্খল চ্যুত হয়। শুধু তাই নয় শৃঙ্খল চ্যুত হয়ে পূর্বের নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করতে হয়। এভাবে সবাই যদি ঐ সীমানা অতিক্রম করতে পারে তাহলে এক 'পাট্টি' বা এক পয়েন্ট হয়। কিন্তু বিপক্ষের খেলোয়াড়রা শৃঙ্খল চ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা পালিয়ে যাবার সময় যদি কাউকে স্পর্শ করতে পারে তাহলে বিপক্ষ দল দান পায়। অর্থাৎ একজনের স্পর্শ দোষে সবাই মারা পড়ে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে এবং পাট্টির সংখ্যা অনুযায়ী জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি ঘটে। প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ্য—'লাঠি' এই খেলার উপকরণ হিসাবে সমস্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না। শুধুমাত্র 'গর্ত'কে কেন্দ্র করেও খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

পর্যবেক্ষণ ঃ হাত ও চোখের সমন্বয়, ক্ষিপ্রতা, গতি, অনুমান শক্তি এই খেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

সংযোজন ঃ 'গোল্লাছুট' খেলাটি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত হওয়ার প্রেক্ষাপট হিসাবে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ তাঁদের সুচিন্তিত মতামত পোষণ করেছেন। যেমন বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশরাফ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, "তারা কিছুক্ষণ হাত ধরে ঘুরতে ঘুরতে চক্রাকারে গোল্লার চারপাশ দিয়ে যেন এক সূত্রে বাঁধা একটি সমাজ। তারপর সীমানা

অতিক্রমের জন্য খসে পড়তো। অর্থাৎ চারদিকে শত্রু কিন্তু দৌড়ের জোরে শত্রুসীমা অতিক্রম করে নিরাপদ স্থলে পৌঁছতে হবে।"[৮] আবার ড. অসীম দাস বলেছেন "... নগর সভ্যতায় প্রচলিত দাস শ্রমিকদের একটি অলিখিত জীবন কাহিনী গোল্লাছুট খেলায় সুস্পষ্ট পদচিহ্ন রেখে গেছে...।"[৪] তাছাড়া শঙ্কর সেনগুপ্ত এই খেলাটির ভেতর দিয়ে "আত্মরক্ষার প্রস্তুতি, হানাদার সম্পর্কে সতর্কতা এবং বন্দি মুক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়"[১৩] বলে উল্লেখ করেছেন।

তথ্যসূত্র

১। আহমদ, ওয়াকিল : **বাংলার লোকসংস্কৃতি,** বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪।

২। মুখোপাধ্যায়, সুব্রত : **সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া,** লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।

৩। সেনগুপ্ত, পল্লব : **লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,** পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫।

৪। দাস, অসীম : **বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস,** পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১।

৫। চক্রবর্তী, বরুণকুমার : **বাঙলার লোকক্রীড়া,** লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।

৬। হাই, আব্দুল : **Traditional Culture in East Pakistan,** উল্লেখ করেছেন, চক্রবর্তী, বরুণকুমার তাঁর 'বাঙলার লোকক্রীড়া' নামক গ্রন্থে, যা লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ ২০০১ সালে প্রকাশ করেছে।

৭। ইসলাম, মাযহারুল তরু : **চাঁপাই নবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতি পরিচিতি,** বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯।

৮। সিদ্দিকী, আশরাফ : **লোকসাহিত্য,** প্রথম খণ্ড, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬।

৯। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : **বাংলার লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া,** ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩।

১০। সুর, অতুল : **বাংলার সামাজিক ইতিহাস**, কলিকাতা, ১৯৭৬।

১১। মিত্র, সতীশচন্দ্র : **যশোহর খুলনার ইতিহাস**, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫।

১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : **লোকসাহিত্য**, কলিকাতা, ১৯৭১।

১৩। সেনগুপ্ত, শঙ্কর : **বাঙালীর খেলাধূলা**, ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬।

পঞ্চম অধ্যায়
লোকক্রীড়া ও শরীর চর্চা

অঙ্গ সঞ্চালন জীবের ধর্ম। বেঁচে থাকার তাগিদে জীবজগতের প্রতিটি প্রাণীকেই কর্মক্ষম থাকতে হয়েছে। পরিশ্রমী হতে হয়েছে খাদ্যান্বেষণের জন্য, যার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। আদিমকালে মানুষকে খাবার সংগ্রহের জন্য গাছ বেয়ে উঠতে হত, শিকারের পেছনে ছুটতে হত, খাল-নালা লাফ দিয়ে পেরোতে হত, বনে জঙ্গলে দৌড়ে বেড়াতে হত। বর্তমানেও সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই এই চিত্রটি বিদ্যমান। ব্যতিক্রম যান্ত্রিক সভ্যতায় উন্নত মানুষ। মানুষ যত উন্নত হয়েছে পরিশ্রম করার প্রবণতা ততই কমেছে। প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার বিকাশে মানুষের পরিশ্রম করার প্রয়োজনও কমে গেছে। কিন্তু আদিম মানুষের সঙ্গে উন্নত মানুষের শারীরিক বিষয়ের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। একমাত্র মস্তিস্কের কার্যক্ষমতা বেড়েছে, ধূসর পদার্থের (Greymatter) পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ কোষ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির পরিবর্তন তুলনামূলক ভাবে নগণ্য। ফুসফুস, হার্ট, কিডনী শরীরের প্রধান অঙ্গগুলি আজও একই রয়ে গেছে। শারীর বিজ্ঞানীরা একমত হয়ে বলেছেন, দেহের অঙ্গগুলির কার্যক্ষমতা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় যখন সেই অঙ্গগুলি পরিশ্রম জনিত চাপের মধ্যে কাজ করে। বিগত দিনে মানুষকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে প্রচুর পরিশ্রম যুক্ত কাজ করতে হত। ফলস্বরূপ দেহের অঙ্গগুলির কার্যক্ষমতা অনেক উন্নত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকের সঙ্গে ঐ শতাব্দীর শেষ দুটি দশকের জীবন যাত্রার মান ও ধারা তুলনা করলে দেখা যাবে বিগত ৫০-৬০ বছরের মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রা সক্রিয়, সচল, কর্মমুখর থেকে নিস্ক্রিয়, অচল, কর্মবিমুখ জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে মানুষের বেড়েছে প্রচুর অবসর। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৯১৬ সালে একজন মানুষের সপ্তাহে কাজের সময় ছিল ৭২-৭৮ ঘন্টা। আর অবসর ছিল ১৪-১৬ ঘন্টা। ১৯৮৪ সালে সেই সমীক্ষায় দেখা যায় কাজের সময় কমে হয়েছে ৩৬-৩৮ ঘন্টায়। আর অবসর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪-২৮ ঘন্টায়। এই অবসর সময় বৃদ্ধির হার গত সত্তর বছরে যত দ্রুত বেড়েছে, বিগত শতাব্দীগুলিতে তা সম্ভব হয় নি।[১]

প্রযুক্তির অসামান্য অগ্রগতি, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা মানুষকে নিষ্ক্রিয় জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম বিনোদনের পসরা নিয়ে মানুষের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ফলে মানুষকে বিনোদনের জন্যও আর ঘরের বাইরে বেরোতে হয় না। এই পরিবর্তিত জীবনধারা মানুষের সমস্যা দিনে দিনে বাড়িয়ে তুলছে। পরিশ্রমের চাপ না থাকায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং মানুষ নিজেই তার জীবনের জৈবিক ক্রিয়াকলাপের বিঘ্ন ঘটিয়ে চলেছে। শারীর বিজ্ঞানীরা প্রচুর তথ্য দ্বারা মানুষকে সচেতন ও সক্রিয় জীবন ধারায় অভ্যস্ত হবার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন,

ধারাবাহিক ভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের সঙ্গে উপযুক্ত বিশ্রাম, আহার, বিনোদন না থাকলে শরীরের প্রাণশক্তি কমে আসে। পাশাপাশি এও দেখিয়েছেন যে, অতিরিক্ত অবসর ও অপরিমিত আহার মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে দুরারোগ্য বিপাকীয় বিপর্যয় (Metabolic Disorder) জনিত ব্যাধির দিকে, যেমন - হার্টের বিভিন্ন অসুখ, রক্তে অতিরিক্ত শর্করা জনিত অসুখ, কোলনক্যান্সার ও বাত জনিত অসুখ। এই সমস্ত কারণে শারীর বিজ্ঞানীরা শরীর চর্চার উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যা মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে প্রভূত সাহায্য করছে। শরীর চর্চার ফলে মানুষের শারীরিক উন্নতি ঘটে। ব্যক্তির পেশী সমূহ আয়তন ও শক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তি শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়। পেশী সমূহের এই উন্নতি সাধন ব্যক্তির কার্য ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। নিয়মিত ভাবে শরীর চর্চার ফলে পেশী সমূহের প্রকৃতিও বেশী পরিমাণ কাজ করার অনুকূল হয়ে পড়ে। শরীর চর্চার ফলে ব্যক্তির জৈবিক ক্ষমতা (Organic efficiency) বাড়ে। ফলে ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতা ও কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জৈবিক বিকাশ (Organic Development), ব্যক্তির সংবহন, শ্বসন, পরিপাক, রেচন ও স্নায়ু তন্ত্রের (Circulatory, Respiratory, Digestive, Excreatory, Nervous) কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। এই সমস্ত অঙ্গ ও তন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে কোন একটি কাজ করতে সক্ষম হয়। সর্বোপরি শারীরিক সক্ষমতা বাড়ে। সুতরাং জীবনকে উপভোগ করে তোলার ক্ষেত্রে শরীর চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।[২]

শরীর চর্চার মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা ও শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়াগুলির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা বাড়ানো যায়। শরীর চর্চা শুধুমাত্র শারীরিক ও শারীরবৃত্তিয় সুফল দেয় না, মানসিক ও সামাজিক ভাবে মানুষকে সমৃদ্ধ করে। বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়, ভাব বিনিময় হয়, অন্যদিকে শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, উদ্বেগ ও অবসাদ দূর করে, মানসিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে।

শরীর চর্চার যে সমস্ত মাধ্যম আছে ক্রীড়া বা খেলাধূলো সেগুলির মধ্যে অন্যতম। ক্রীড়ার মধ্য দিয়ে অবসর বিনোদন ও শরীর চর্চা দুই-ই হয়। এই গ্রন্থে পূর্বেই ক্রীড়াকে দুটি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে— যথা লোকক্রীড়া ও শিষ্টক্রীড়া। শিষ্টক্রীড়াগুলি সাধারণতঃ শহুরের পরিমণ্ডলে উদ্ভূত। লোকক্রীড়াগুলি ঠিক বিপরীত, গ্রাম্য পরিমণ্ডলে উদ্ভূত। শরীর চর্চার ক্ষেত্রে লোকক্রীড়া ও শিষ্টক্রীড়া দুটিরই বিশেষ গুরুত্ব আছে। গ্রামীণ মানুষেরা বিশেষ করে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা শরীর চর্চা ও অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে লোকক্রীড়াকেই বেছে নিয়েছে। আদিম যুগ থেকে এই ধারা অব্যাহত আছে। প্রাক্‌বৈদিক যুগে বাঁশী, মাটির তৈরী পাখী, পশু ও মানুষের মূর্ত্তি নিয়ে শিশুরা খেলত। এছাড়া শিকার করা, বিভিন্ন নৃত্য প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে শরীর চর্চা ও অবসর যাপন করত। বৈদিক যুগে তীর-ধনুক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতির ব্যবহারে শক্তি ও ক্ষিপ্রতার পরীক্ষা হত। এছাড়া ঘোড়দৌড়, রথচালনা, লাঠি খেলা, তরবারী চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ, হাঁটা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি শরীর চর্চার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে ধনুর্বিদ্যা, মল্লক্রীড়া, গদা সঞ্চালন, সাঁতার, নৃত্য প্রভৃতি ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। এই যুগে হাঁটা প্রতিদিনের ব্যায়াম ছিল। সাঁতার, মল্লক্রীড়া, মুষ্টিযুদ্ধ, অসিচালনা, অশ্বারোহণ এবং নানা

রকম বলের খেলার মাধ্যমে শরীর চর্চা হত। মুসলিম যুগে প্রায় সব মোঘল সম্রাটই সাঁতারে দক্ষ ছিলেন। এছাড়া অশ্বারোহণ, তীরচালনা, তরবারী চালনাতেও তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। চৌপর, চৌঘান প্রভৃতি খেলায় অসামান্য দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। সম্রাট আকবর এই খেলাগুলিতে রীতিমত দক্ষ ছিলেন। ঐ যুগে খেলাধূলা ও শরীর চর্চা মূলতঃ রাজপরিবার, উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্গের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গরীব, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাত্রায় খেলাধূলা ও শরীর চর্চার ইতিবৃত্ত ঐতিহাসিক দলিলে লিপিবদ্ধ নেই বললেই চলে। কিছু প্রাপ্ত তথ্য থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, সাধারণ মানুষকে জীবন নির্বাহ করতে প্রতিদিনই অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হত। এর বাইরে সংগঠিত শরীর চর্চা বা খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করার মত অবসর তাদের হাতে খুব কমই থাকত। বৃটিশ যুগে জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউয়ে বিভিন্ন রকম শরীর চর্চা ও খেলাধূলার বিকাশ ঘটে। যেমন - লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, তরবারি চালনা, কুস্তি, ডন বৈঠক ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলেও শরীর চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমস্ত ক্রীড়া গুলিকেই তারা শরীর চর্চার মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিল।

বাংলার লোকক্রীড়াগুলি বৈচিত্র্যে ভরা। এই লোকক্রীড়াগুলি গ্রামীণ মানুষের বেঁচে থাকার রসদ। গ্রামীণ মানুষকে সুস্থ-সবল ও কর্মঠ রাখতে এই ক্রীড়াগুলি তাদের অজান্তেই প্রভূত উপকার সাধন করে আসছে। লোকক্রীড়ার বিভিন্ন আঙ্গিক বিশ্লেষণ করলে আমরা এর উপকারগুলি সহজেই উপলব্ধি করতে পারব। 'ডাংগুলি' নামক লোকক্রীড়াটিতে হাতের পেশী শক্তি, হাত ও চোখের সমন্বয় (Hand-eye co-ordination), প্রখর অনুমান শক্তি খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ে। খেলাটির সঙ্গে খেলোয়াড়ের প্রতিবর্ত ক্রিয়াও (Reflex action) লক্ষণীয়। 'গাদি' খেলাটিতে ক্ষিপ্রতা, অনুমান শক্তি, প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও অবাত ক্ষমতা (Anaerobic Capacity) খুবই প্রয়োজন। গাছের লোকক্রীড়াগুলিতে শারীরিক পটুতা, পেশীশক্তি, স্নায়ু পেশীর সমন্বয়, অনুমান শক্তি ও বিস্ফোরক শক্তি একান্ত ভাবে জরুরী। 'চামড়ী' খেলাটিতে আধুনিক যুগে ডাম্বেল, ওয়ান্ড, পোল এই জাতীয় কিছু হাল্কা সরঞ্জাম নিয়ে ব্যায়ামের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়, যা নিয়মিত চর্চা করলে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়। এই চামড়ি খেলায় পেশীর সমন্বয়, পরিশ্রমের ফলে পেশীর রূপায়িত অবস্থার (Conditioned) পরিবর্তনও হয়। 'লাঠি টানাটানি', 'বাগড়ী', 'চেংগীডাণ্ডি' প্রভৃতি লোকক্রীড়ায় পেশীর সর্বাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

পেশীর সহনশীলতা ও বিস্ফোরক শক্তি জলের খেলাগুলির ক্ষেত্রে খেলোয়াড়ের নৈপুণ্যের নির্ণায়ক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। হৃদ-শ্বসন (Cardio-respiratory) ক্ষমতা প্রভূত উন্নত করা সম্ভব নিয়মিত সাঁতার বা জলের খেলাগুলির মধ্য দিয়ে। জলের মধ্যে অনুষ্ঠিত লোকক্রীড়াগুলিতে শরীর সঞ্চালক গুণাবলীও লক্ষ্য করা যায়। ব্যাঙ লাফানো খেলায় খোলা ছোঁড়ার সময় কনুই থেকে Flexion এবং পরে Extension হয়। এছাড়া কাঁধের পেশীর কাজ হয়। কাঁধের পেশী শক্তির উপরই খেলাটি নির্ভরশীল। কনুই ও কাঁধের সন্ধির সমন্বয়ও খেলাটিতে লক্ষ্য করা যায়। 'ডুব সাঁতারে' শরীরের সমস্ত অঙ্গের ব্যায়াম হয়, শ্বাস ধারণ ক্ষমতা (Breath holding capacity) বাড়ে। হাত ও পায়ের

দক্ষতা বাড়ে। নিয়মিত অনুশীলনে শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 'নলছিটি' ও 'হোলডুগ' খেলা দুটিতে অনুমান শক্তি, সাঁতারে পটুত্ব ও Breath holding capacity বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 'কুমির কুমির' খেলায় ক্ষিপ্রতা, প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা, অনুমান, সমন্বয় প্রভৃতি শরীর সঞ্চালক গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়। 'এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা' খেলায় শক্তি বিশেষ করে হাতের শক্তির প্রয়োজন হয়। শারীরিক সক্ষমতা ও সমন্বয়ের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। 'কুকুর শকুনি' খেলায় ক্ষিপ্রতা, গতি, সহনশীল শক্তি ও সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। 'ফিঙে কাক' খেলায় সমস্ত অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে, বিস্ফোরক শক্তি ও অনুমান শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। আমরা জানি, মানুষের শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে, শরীরকে সুস্থ, সবল, সক্রিয় ও কর্মক্ষম রাখতে শরীর সঞ্চালক অংশগুলিতে কিছু কিছু গুণমানের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। এই গুণমানের উন্নতি ও সমন্বয় আনতে পারলেই শরীর সাধারণ সক্ষমতা লাভ করে। এই গুণগুলিকে এক সাথে বলি সঞ্চালক গুণাবলী বা Motor qualities। এই গুণগুলির সমন্বয় সাধনে সক্ষম হলে তা শরীরের পেশীতন্ত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার উপর কার্যোপযোগী চাপ সৃষ্টি করে। ফলে শরীর সাধারণ সক্ষমতা লাভ করে। তারই ফলে সাধারণ ভাবে শারীরিক সক্ষমতা বা General physical fitness এর বিকাশ ঘটে। লোকক্রীড়াগুলি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সাধারণ পটুতা বৃদ্ধি হয়, সাধারণ সমন্বয় ও স্কিলের উন্নতি হয়, সাধারণ কৌশল প্রয়োগ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, একঘেয়েমি দূর হয়, আঘাত বা রোগ ভোগের পর শারীরিক পুনর্বাসন সম্ভব হয়, বিশ্রাম বা রিলাক্সেশন হয়, শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের পেশী তন্তুর উন্নতি হয়, কৌশল ও কৌশল প্রয়োগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বিগত দিনে মানুষকে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হত। স্বভাবতঃই সেই যুগে অবসর বিনোদনের জন্য মানুষ যে সমস্ত ক্রীড়ার সৃষ্টি করেছিল তার একটা বড় অংশ তত শ্রম সাপেক্ষ নয়। লোকক্রীড়া গ্রাম্য পরিমণ্ডলে উদ্ভূত। এই পরিবেশে মানুষকে তুলনামূলক ভাবে বেশী শ্রমসাধ্য কাজ করতে হত। সম্ভবতঃ সেই কারণে অবসর বিনোদনের জন্য শ্রমসাধ্য খেলাধূলার উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে লোকক্রীড়াগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক উপাদান শিষ্টক্রীড়াগুলির তুলনায় কম থাকায় শারীরিক সক্ষমতার বিষয়টি ততোধিক তাৎপর্যপূর্ণ নয়। লোকক্রীড়ায় অংশগ্রহণের জন্য শারীরিক সক্ষমতা ও চাহিদার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। কারণ বেশীরভাগ লোকক্রীড়ার অঙ্গ সঞ্চালন মানুষের দৈনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত স্বাভাবিক অঙ্গসঞ্চালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আবার একথাও সঠিক, বর্তমান বহুল প্রচলিত শিষ্ট ক্রীড়াগুলির বেশ কয়েকটি অতীতে লোকক্রীড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন - বর্তমানে বহুল প্রচলিত 'ফুটবল' খেলা। কথিত আছে ফুটবল খেলা হত দুইটি গ্রামের মধ্যে। দুই গ্রামের মাঝামাঝি একটি জায়গা থেকে পশু চামড়ার দ্বারা নির্মিত একটি গোলাকার বস্তুর দ্বারা খেলা আরম্ভ হত। যে গ্রামের লোকেরা বস্তুটিকে বিপক্ষ গ্রামের সীমা পার করে দিতে পারত তারাই জয়ী হত। মানুষ আনন্দের সঙ্গে এই খেলায় অংশ গ্রহণ করত, শারীরিক কসরৎ করত। এ খেলা ছিল স্বাভাবিক আনন্দের অভিব্যক্তি। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট আইন কানুনের বাঁধনে বাঁধা পড়ে এবং

চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়ে শিষ্ট ক্রীড়ায় পরিণত হয়, যা আধুনিক কালে 'ফুটবল' বা 'সকার' নামে পরিচিত। এই খেলায় শারীরিক সক্ষমতা বিশেষ করে গতি, শক্তি, নমনীয়তা, সহনশীলতা ও সমন্বয়ের এক উন্নত পর্যায়ের রূপান্তরের প্রয়োজন দেখা দিল। অতীতে এই খেলায় তত উন্নত পর্যায়ের শারীরিক সক্ষমতার গুণমানের প্রয়োজন ছিল না, ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা ও অনাবিল আনন্দ। বর্তমান যুগে এই শিষ্ট ক্রীড়াটি জীবিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। আনন্দ থাকলেও, স্বতঃস্ফূর্ততা, অর্থ ও অন্যান্য প্রচারের আলোকে সীমাবদ্ধ।[৩]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে শিষ্ট ক্রীড়াগুলি এখন অনেক মানুষের নাগালের বাইরে। কিছু শিষ্ট ক্রীড়ার মধ্যে উন্নত শারীরিক সক্ষমতা ও ক্রীড়া শৈলী গুণ থাকলেও আঘাত জনিত ঝুঁকির প্রবণতা সব সময় থেকে যায়। অনেক মানুষের অংশগ্রহণের পরিবর্তে শিষ্ট ক্রীড়াগুলি অল্প কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অংশগ্রহণ নয়, নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবেই তারা খেলার উত্তেজনা অনুভব করছেন। কিছুদিন আগেও গ্রাম ও শহরে অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদের মধ্যে খেলায় অংশ গ্রহণের প্রবণতা ছিল অনেক বেশী বর্তমানে যা ক্রম হ্রাসমান।

শরীর চর্চার আঙ্গিকে লোকক্রীড়াগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অল্প কিছু খেলার মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা ও ক্রীড়াশৈলী গুণ বিদ্যমান। কিন্তু শারীর শিক্ষা ও শরীর চর্চার অন্য একটি দিক থেকে খেলাগুলি সমৃদ্ধ। তা হল সবার স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল অংশগ্রহণ। কঠিন নিয়মের অনুশাসনে বাঁধা নয় বলে যে কেউ, যে কোন সময় এই খেলাগুলিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং তার মাধ্যমে শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য যথাযথ ভাবে এই লোকক্রীড়াগুলি মাধ্যমে প্রতিফলিত হতে পারে।

লোকক্রীড়া ও গ্রামীণ জীবন ঃ

পৃথিবীর অনেক দেশের মতই ভারতবর্ষও মূলতঃ গ্রাম প্রধান দেশ এবং গ্রাম ও শহরের জীবন যাত্রা প্রণালী দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই শহুরে জীবনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়তে থাকে এবং প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নগর সভ্যতার ব্যাপক প্রসার ঘটে। শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়া ধীরে ধীরে গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করলেও শহরের মত পুরোপুরি যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়েনি। গ্রামীণ মানুষ জীবন ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পরিশ্রম মুখী। আবহমান কাল থেকেই গ্রাম্য জীবন কষ্টকর, তুলনামূলক ভাবে এক ঘেয়েমিও বটে। কৃষি কেন্দ্রিক জীবন তাদের, যা অত্যন্ত শ্রম সাপেক্ষ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের ভাবনা, চিন্তা, কাজ সবটাই জীবিকা কেন্দ্রিক। আর এই জীবিকা ছিল অনেকাংশে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। প্রখর গ্রীষ্মে, অবিরত বর্ষণে অথবা শীতের শেষে কৃষি কার্যে যুক্ত থাকার পরও তাদের হাতে কিছু অবসর সময় থাকত। এই অবসর আনন্দদায়ক কাজে অতিবাহিত করার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি লোকক্রীড়ার। শিশুরা বড়দের কার্যপ্রণালীকে অনুসরণ করে সৃষ্টি করেছে নানা প্রকার লোকক্রীড়ার। এই লোকক্রীড়াগুলি গ্রামীণ মানুষের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। দিনান্তে কাজের শেষে অথবা বিভিন্ন

সময়ে কাজের অবসরে সহজ, সরল কিছু খেলা (লোকক্রীড়া) মানুষ নিজের তাগিদেই সৃষ্টি করেছে।

প্রকৃতির অফুরন্ত উপাদানে গ্রামীণ জীবন সমৃদ্ধ। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-পুষ্করিণী, গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড় আর উন্মুক্ত আলো-বাতাস পরিবেষ্টিত এই গ্রামীণ জীবন। এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনের অনুকৃতি থেকে গ্রামীণ মানুষ সৃষ্টি করেছে নানা প্রকার খেলার। উন্মুক্ত পরিসর, উপযোগী প্রকৃতি সাহায্য করেছে এই খেলাগুলি সৃষ্টিতে। গ্রামীন জীবনে অনেক গাছের প্রাচুর্য না থাকলে 'গাচ্ছুয়া-গাচ্ছুয়া' খেলাটি হয়তো কোন দিনই সৃষ্টি হত না। অনুরূপ ভাবে গাছের অন্যান্য খেলাগুলির প্রসঙ্গও উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন - 'আব্দুল খেলা', 'ডোল খেলা' প্রভৃতি। গ্রামীণ জীবনে জলাশয়ের অভাব নেই। আর সেই কারণেই সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রকার জলের খেলা - 'হোলডুগ', 'হউড়ি', 'নলছিটি' ইত্যাদি। 'ডাংগুলি', 'চোর-চোর' প্রভৃতি খেলায় কোন বাউণ্ডারি নেই, নির্দিষ্ট সীমা নেই। উন্মুক্ত পরিবেশ ছিল বলেই এই সীমাহীন, বাঁধাবন্ধনহীন, অনাবিল আনন্দের আয়োজন। স্বল্প উপকরণ বা উপকরণ বিহীন, নির্দিষ্ট খেলোয়াড় সংখ্যা ছাড়াই, মাত্র কয়েকজন মিলেই 'ডাংগুলি' বা ঐ জাতীয় খেলায় গ্রামীণ মানুষ মেতে উঠতে পারে। অংশ গ্রহণ কারীর সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পেলেও তাদের সংযোজন করতে এই খেলাগুলিতে কোন অসুবিধা হয় না। এই যে সহজ, সাবলীল, অংশগ্রহণ, যা কোন কঠোর নিয়মে আবদ্ধ নয় এবং কোন বিশেষ সক্ষমতা ছাড়াই সাধারণ শারীরিক সক্ষমতার দ্বারাই সব বয়সের, সব মানুষের স্বাভাবিক অংশ গ্রহণ তা শিষ্টক্রীড়ায় একেবারেই অনুপস্থিত। এই গুণগুলি লোকক্রীড়াকে আলাদা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, আলাদা সার্থকতা দিয়েছে।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মানুষের ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণের একটি অন্যতম কারণ বিনোদন। বিনোদন মূলক তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেছেন নানা প্রকার কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের যে শক্তি ব্যয় হয়, খেলা সেই ব্যয়িত শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে। বিভিন্ন মনোবিদ একথা স্বীকার করেছেন যে, কাজের প্রকৃতির পরিবর্তন মানসিক অবসাদ কমায়, ক্লান্তি, একঘেয়েমি দূর করে এবং উপযোগী মানসিকতা গড়ে তোলে।[৫] গ্রামীণ মানুষ তাদের কাজের প্রকৃতির এই পরিবর্তন লোকক্রীড়াগুলির মধ্য দিয়ে ঘটিয়েছে। তারা অফুরন্ত লোকক্রীড়ার সৃষ্টি করেছে জীবন ধারণের রসদ হিসাবে। গৃহজীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য ঘরের ভেতরের খেলার সৃষ্টি করেছে। খেলাগুলির সঙ্গে ছড়ার সংযুক্তি ঘটিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ঘরের ভেতরের খেলাগুলি যেমন — 'আগডুম বাগডুম', 'ইকিড়-মিকিড়', 'রসকস', 'কড়ি খেলা', 'চোর-পুলিশ', 'ষোল ঘুটি', 'বাঘবন্দী' ইত্যাদি, যার অন্যতম উদ্দেশ্য অবসর বিনোদন। ঘরের বাইরেরও নানা প্রকার খেলা তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, যেগুলি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপকরণযুক্ত। ঘরের বাইরের খেলা যেমন — 'কানামাছি', 'গাদি', 'ডাংগুলি', 'গোল্লাছুট', 'বউবাসন্তি', 'কুমিরডাঙ্গা' - এরকম অফুরন্ত খেলা। গ্রামীণ মানুষ এই লোকক্রীড়াগুলিকে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার মাধ্যমে অবসর বিনোদন ও শরীর চর্চা দুই-ই হয়ে থাকে। এইখানেই গ্রামীণ মানুষের সার্থকতা, ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতা।

শিষ্টক্রীড়া ও শহুরে জীবন ঃ

আজ থেকে প্রায় ২ হাজার বছর আগে রোমানদের হাতে গ্রীকরা পরাজিত হবার পর গ্রীক সভ্যতায় শরীর চর্চা ও খেলাধূলার যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল ধীরে ধীরে তা হ্রাস পেতে থাকে। এই সময়েই প্রাচীন ওলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায় রোম সম্রাট থিওডোসিয়াসের আদেশে। প্রাচীন ওলিম্পিকের অবলুপ্তি ঘটে। সক্রিয় জীবন এবং শক্ত সামর্থ শরীর গঠনের যে বিশ্বাস ও দর্শন গ্রীক সভ্যতায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল, রোম সভ্যতায় তার বিপরীত ধারা পরিলক্ষিত হয়। সক্রিয় ভাবে খেলাধূলায় অংশ গ্রহণের পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় থেকে ক্রীড়ার আনন্দ ও বিনোদন উপভোগ করার এক নতুন দর্শন এই সময়ে চালু হয়। এশিয়া মাইনরে রোম সম্রাটরা অ্যাম্পিথিয়েটার স্থাপন করেন, যা বর্তমান ষ্টেডিয়ামের ক্ষুদ্র সংস্করণ। অংশ গ্রহণ না করে দর্শক আসনে বসে খেলার আনন্দ উপভোগ করা নগর সভ্যতার সংস্করণ। রোম সম্রাটরা এই সময়ই গ্ল্যাডিটরিয়াল লড়াই এর ব্যবস্থা করেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শক্তিশালী পশুর সঙ্গে দাস শ্রমিকদের মধ্য থেকে একজন শক্তিশালী মানুষকে নির্বাচন করা হত এই যুদ্ধের জন্য। আমরন কাল পর্যন্ত এই খেলা চলত। এই নিষ্ঠুর হিংস্র লড়াই অ্যাম্পিথিয়েটারে বসে মানুষ নিষ্ক্রিয় থেকে উপভোগ করত।[৫]

রেনেসাঁর পরবর্তী সময়ে শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়ায় নগর ও শহরগুলির দ্রুত পরিবর্তন শুরু হল এবং নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হল। এই নতুন নগর সভ্যতার সবকিছুই আর্থিক বা বাণিজ্যিক দিক থেকে পরিচালিত হতে থাকল। ক্রীড়া কোন ব্যতিক্রম নয়। সহজ, সরল, আনন্দদায়ক অভিব্যক্তির খেলা নিয়মের শৃঙ্খলে, উপকরণের প্রাচুর্যে ক্রমশ বিনোদনের পণ্য হয়ে উঠল। সভ্যতা, সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন খেলা সৃষ্টি হতে থাকল। এই খেলাগুলিকেই বর্তমান গ্রন্থে শিষ্টক্রীড়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শহুরে জীবন অত্যন্ত দ্রুত ও গতিময়। জনবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী। ফলে খেলার মাঠ বিশেষ করে শিষ্টক্রীড়ার মাঠ অত্যন্ত অপ্রতুল। শিষ্টক্রীড়ার সরঞ্জামও সুলভ নয়। স্বভাবতঃই মাঠের এবং সুলভ সরঞ্জামের অপ্রতুলতা শিষ্টক্রীড়ার সার্বজনীনতা হরণ করেছে। অর্থাৎ খেলা সব বয়সের, সব মানুষের এই ধারণা শহুরে পরিমণ্ডলে সর্বজন গ্রাহ্য নয়। অন্যদিকে কিছু মানুষ অর্থের বিনিময়ে খেলার পসরা সাজিয়ে রাখে। অর্থাৎ অর্থ যার, খেলা তার, এখানেও খেলা তার সার্বজনীনতা হারিয়েছে। শহুরে জীবনে অবসর, বিনোদনের অনেক সুব্যবস্থা রয়েছে। স্বভাবতঃই খেলা অবসর বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম এ ধারণাও সে ভাবে গৃহীত হয় নি। শহুরে জীবনে তাই খেলাকে কেন্দ্র করে এক দ্বান্দ্বিক রূপের প্রকাশ চোখে পড়ে। কেউ অর্থের বিনিময়ে খেলাকে গ্রহণ করছে, কেউবা খেলায় অংশ গ্রহণ নয়, নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে খেলা দেখে বা অন্যকোন ভাবে অবসর বিনোদন করছে। আবার কেউ বা প্রবৃত্তির তাড়নায় পার্ক, সরু রাস্তা অথবা বসতির মাঝে ছোট এক ফালি জমিতেই খেলায় মেতে উঠছে। পরিশেষে একথা বলা যায় যে, খেলা অবশ্যই মানুষের প্রবৃত্তিগত বাসনা। কিন্তু বিশেষ করে শহুরে জীবনে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার কারণে আজও সার্বজনীন হতে পারেনি, যেখানে লোকক্রীড়া অনায়াসে সার্বজনীন হতে পেরেছে।

শহুরে জীবনে যে শিষ্টক্রীড়ার প্রসার ও প্রচলন ঘটল তার বেশীর ভাগই বড় শহর

কেন্দ্রিক। কয়েকটি খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং খেলা দেখার জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম হতে থাকল। নতুন নতুন ষ্টেডিয়ামের পত্তন শুরু হল এবং দর্শক মনোরঞ্জন ক্রীড়ায় (Spectator Sports) রূপান্তরিত হতে থাকল। শিষ্ট ক্রীড়া গুলির বেশীর ভাগই প্রতিযোগিতামূলক। সেই কারণে কেবলমাত্র দক্ষ ও সহজাত ক্রীড়া প্রতিভা সম্পন্ন যুবকরাই এই খেলাগুলিতে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত হতে থাকল। তুলনামূলক ভাবে যুবতীদের অংশ গ্রহণ খুবই কম। প্রতিযোগিতা শিষ্ট ক্রীড়ার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত উচ্চমানের প্রতিযোগিতা দর্শকদের আকৃষ্ট করে, খেলোয়াড়দেরও শারীরিক সক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা ও ক্রীড়া শৈলী প্রকাশ করতে হয়, না হলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় না। ফলে শিষ্ট ক্রীড়াগুলি যতই প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে ততই অংশ গ্রহণ কারীর সংখ্যা তুলনা মূলক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। শিষ্ট ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ কারীর শারীরিক ক্রিয়া কর্মের মান শরীর চর্চার মাধ্যমে এক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছানো প্রয়োজন এবং সেই মানে পৌঁছাতে গেলে শারীরিক সক্ষমতার মানও উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে হয়। এর ফলে কিশোর এবং যুবকদের কেবলমাত্র একটি অংশই এই নতুন প্রযুক্তি সম্পৃক্ত ক্রীড়ায় (শিষ্ট ক্রীড়া) অংশ গ্রহণ করছে আর বৃহৎ অংশ নিষ্ক্রিয় থেকে দর্শক হয়ে বিনোদন উপভোগ করছে। শহরে প্রচলিত শিষ্ট ক্রীড়া এই জন্যই এর সার্বজনীন রূপটি হারিয়ে ফেলেছে।

শরীর চর্চার আন্তর্জাতিক ভাবনা ঃ

১৯৭৮ সাল থেকেই UNESCO সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে একটি বার্তা পৌছে দিয়েছিল যে, শারীর শিক্ষা, শরীর চর্চা ও খেলাধুলার সুযোগ মানুষের মৌলিক অধিকার। রুশ বিপ্লবের পরে রাশিয়ার পুনর্গঠনের সময় খেলাকে স্বাস্থ্যের পরিপূরক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ হিসেব নিকেশ করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, খেলাধুলোর উন্নত পরিকাঠামো এবং ব্যবস্থা করলে আখেরে তা রাষ্ট্রের জন্য লাভজনক। কেননা তাতে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাদির জন্য বিনিয়োগ কম লাগে, যার পরিমাণ বেশ উল্লেখযোগ্য। স্বভাবতঃই ইউরোপ, আমেরিকা ও উন্নত দেশগুলিতে শরীর চর্চা ও খেলাধুলার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে উন্নতিশীল ও উন্নতিকামী দেশগুলির তুলনায়। উন্নতিশীল ও উন্নতিকামী দেশগুলিতে খেলাধুলো ও শরীর চর্চার উন্নত পরিকাঠামো গড়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু আজও তা সেই তুলনায় গড়ে ওঠেনি। এই গড়ে না ওঠার একটি অন্যতম কারণ যদি হয় অর্থ, তাহলে আর একটি অবশ্যই চেতনার অভাব। বৈজ্ঞানিক সত্য থেকে প্রতিষ্ঠিত নীতি ও দর্শন যা জীবনের ক্ষেত্রে মানুষ গ্রহণ করে এবং জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রীড়াকে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলি গ্রহণ করেনি। স্বভাবতঃই জীবনধারায় শরীর চর্চা বা খেলাধুলার সংযুক্তি তত নিবিড় নয়। সক্রিয় জীবনের বিপরীতে নিষ্ক্রিয় ভাবে থেকে অনেক মানুষ তাই নানান ব্যাধির শিকার হচ্ছেন। অন্যদিকে ক্রীড়া বা শরীর চর্চাকে আমাদের দেশে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করার অনীহাও লক্ষ্য করা যায়। ফলে ক্রীড়া আজও জীবন নির্বাহ করার অন্যতম উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়নি। UNESCO বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির চেষ্টা ও প্রচার এখনও কোন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়নি।

নিষ্ক্রিয় জীবনধারা আজ সারা পৃথিবী ব্যাপী একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা বলে চিহ্নিত। আমেরিকা, ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি এই ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। হার্ট এবং অন্যান্য কয়েকটি অসুখের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভাবে প্রতিষেধক শক্তি বাড়াবার লক্ষ্যে শরীর চর্চাকে একটি মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ এবং জাতি সংঘের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও পৃথিবীর ক্রীড়া ও শরীর চর্চা সংক্রান্ত সংস্থাগুলি একযোগে স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধে শরীর চর্চার ভূমিকাকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। UNESCO দাবী সনদ নির্দিষ্টভাবে শারীরশিক্ষা ও শরীরচর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটাবার কথা বললেও UNESCO'র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি এর প্রসারে তেমন উদ্যোগ নেয় নি। সেই কারণে UNO, UNESCO, WHO, IOC প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কর্ণধারেরা ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে বার্লিনে একটি বিশ্ব সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনে আলোচনার মূল বিষয়বস্তুই ছিল শরীর চর্চার প্রসার ঘটানো। স্লোগান তোলা হয়েছিল 'শরীর চর্চা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, শরীর চর্চা রোগ প্রতিহত করার জন্য।' এরপরই ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে উরুগুয়ের পুন্টা-ডেল-এস্টা (Puntadel Este) শহরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্রীড়া ও শারীর শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রী ও পদাধিকারীদের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'উরুগুয়ে ঘোষণা' নামে পরিচিত যে দাবী সনদ এই সম্মেলনে গৃহীত হয় তা UNESCO'র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির কাছে পাঠানো হয় নিজ নিজ দেশে তা প্রয়োগ করার জন্য। এই ঘোষণার কিছু উল্লেখযোগ্য দিক হল —

১) মানব সম্পদ ও সামাজিক বিকাশের স্বার্থে শারীর শিক্ষাকে ব্যবহার করতে হবে।

২) জাতি সংঘের UNDP প্রকল্পের মাধ্যমে শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলার জন্য উন্নত দেশগুলি থেকে অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশে সাহায্য পাঠাতে হবে।

৩) শিশুদের প্রতি হিংসা বন্ধ করতে ও শিশু অপরাধীর সংখ্যা দ্রুত কমাতে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার অবাধ সুযোগ করে দিতে হবে।

৪) খেলাধূলা ও শরীর চর্চায় মহিলাদের অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে এবং এমন পরিবেশ তৈরী করতে হবে যাতে তারা বিনা বাধায় অংশগ্রহণে উৎসাহ পায়।

৫) খেলা সব বয়সের সব মানুষের - এই কথা মনে রেখে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) খেলাধূলা ও শরীর চর্চা বিষয়ক বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৭) উন্নত মানের শ্রমিক দল সৃষ্টি করতে সচেতন ভাবে শারীর শিক্ষাকে ব্যবহার করতে হবে।

৮) ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকদের মাসুল ছাড় দিতে হবে যাতে সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

৯) অবসর - সময় নিষ্ক্রিয় বিনোদন নয়, সক্রিয় বিনোদনে উৎসাহ দিতে হবে।

১০) লোকক্রীড়া ও ঐতিহ্য বহনকারী দেশীয় খেলাধূলায় উৎসাহ দিতে হবে।

লোকক্রীড়া ও ঐতিহ্য বহনকারী দেশীয় খেলাধূলার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ —

(ক) এই খেলাগুলির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

(খ) লোকক্রীড়া ও দেশীয় ক্রীড়াগুলির উৎসবের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) পৃথিবীব্যাপী লোকক্রীড়া ও দেশীয় ক্রীড়াগুলির আন্তর্জাতিক উৎসবের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) জাতীয় স্তরে লোকক্রীড়া ও দেশীয় ক্রীড়ার সংস্থা তৈরী করতে হবে এবং একটি আন্তর্জাতিক **Network** তৈরী করতে হবে।[৬]

উরুগুয়ে ঘোষণার অন্তর্গত শরীর চর্চা এবং শারীর শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য দাবি সনদের মধ্যে লোকক্রীড়া ও দেশীয় ক্রীড়ার প্রসার ঘটানোর বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই গ্রন্থে যা বারবার দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। লোকক্রীড়ার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা সহজ সাবলীলভাবে মানুষকে আনন্দ দিতে পারে এবং তাকে সক্রিয় রাখতে পারে। শিষ্টক্রীড়ায় এক বিশেষ ধরনের আকর্ষণ আছে যার মাত্রা এবং ব্যাপকতা অনেক বড় হলেও সরাসরি ভাবে অনেক মানুষকে স্পর্শ করে না। তাই শিষ্ট ক্রীড়ার সরাসরি অংশ গ্রহণের সুযোগ এবং সম্ভাবনা খুবই সীমিত। অন্যদিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে মানুষকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে লোকক্রীড়া ও দেশীয় ক্রীড়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। "খেলা সব বয়সের, সব মানুষের" এই আহ্বান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি থেকে রাখা হয়েছে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সব মানুষের কাছে সুস্থ ও সক্রিয় জীবনের সন্ধান দিতে হলে লোকক্রীড়া ও দেশীয় ক্রীড়া হতে পারে তার উপযুক্ত মাধ্যম। তাই লোকক্রীড়ার ব্যাপক প্রসার ও প্রচার সংগঠিত ভাবে করা এই মুহূর্তে জরুরী।

তথ্যসূত্র

১। Banerjee, A.K. : Keynote address delivered in **The State Conference on Physical Education in Modernday Perspective** held on 2nd December, 1995 at Post Graduate Training College for Physical Education, Banipur (W.B.).

২। Fox, Edward L. and Mathews, Donald K. : **The Physiological Basis of Physical Education and Athletics,** Saunder College Publishing, Philadelphia, 1981

৩। Edmundson, J. : **All About Football,** The Chaucer Press Ltd. London, 1970

৪। রায়, সুশীল : **শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন,** সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা ১৯৯৮।

৫। Shephard, R.J. : **Physical Activity and Growth,** Year Book Medical Publishers, Inc. Chicago, London, 1982.

৬। Yang, D.J. : **Report on the 3rd International Conference of Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education and Sport (MINEPS III),** Puntadel Este, Uruguay, 30th November to 3rd December, 1999-Paper Presented at the First ICHPER-SD Leadership Development Conference, March 21, 2002, Orlando, Florida, USA.

কথাসাঙ্গ

"সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোট বড়ো অনেক জিনিষ অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে।" — রবীন্দ্রনাথ লৌকিক উপাদানের গুরুত্ব অনুভব করে তার সংগ্রহ, প্রসার ও চর্চার কথা বহু পূর্বেই উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর কথা অনুসারে লোকক্রীড়া প্রসঙ্গে এই একই ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন। এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থানগত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন লোকক্রীড়ার বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত কাঠামোগত বিশ্লেষণে সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অনুভব করা সম্ভব। অর্থাৎ এই সব লোকক্রীড়ার মধ্যে প্রতীকের আড়ালে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক উপাদান বা তথ্য লুকিয়ে রয়েছে। এই সব তথ্যাদির তাৎপর্য উদঘাটন যথার্থ পরিকল্পনা মাফিক গভীর গবেষণার মাধ্যমেই সম্ভব। অর্থাৎ মানববিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান গত ভাবে গবেষণার সাহায্যে লোকক্রীড়ার মধ্য দিয়েও বাঙালীর জাতি সত্তা ও আত্ম পরিচয় অন্বেষণ সহজতর হয়। এখানেই বর্তমান গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিক তাৎপর্য।

লোকক্রীড়া, ক্রীড়ার ইতিহাসে অতি প্রাচীনতম ধারা এবং ঐতিহ্যময়। সাধারণভাবে যাবতীয় ক্রীড়ার মূল শিকড় হিসাবে লোকক্রীড়াকে অভিহিত করা যেতে পারে। একথার প্রমাণ পূর্ববর্তী আলোচনাতে দেখানো হয়েছে। যাই হোক লোকক্রীড়া সম্পর্কে বাঙালী পণ্ডিত ও গবেষকবৃন্দের লেখা বা তথ্যানুসন্ধান খুব সামান্যই পরিলক্ষিত হয়েছে। বরং সেই তুলনায় বিদেশী গবেষকবৃন্দ এ ক্ষেত্রে অনেক বেশী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তবে একথার অর্থ এই নয় যে, দেশীয় গবেষকরা একেবারেই এ সম্পর্কে আলোকপাত ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেননি। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন গবেষক লোকক্রীড়া প্রসঙ্গে যে ধরনের কাজ করেছেন তার একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই পর্যালোচনা বর্তমান গ্রন্থ রচনায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে।

বর্তমান গ্রন্থের উপাত্ত সংগ্রহের মূল ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত লোকক্রীড়াগুলি তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের প্রকৃত স্বরূপ সন্ধান করা সম্ভব হয়েছে। এরই পাশাপাশি লোকক্রীড়াগুলিকে সুপরিকল্পিত ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। এই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে লোকক্রীড়ার চরিত্রগত বিভিন্ন গুণাবলী অকপটে প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই ধরনের বিভাজন পরবর্তীতে তথ্যমূলক যথার্থ বিশ্লেষণ ও গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়তা করার পাশাপাশি সহজও করে দিয়েছে। এভাবে এই গ্রন্থে একে একে লোকক্রীড়া সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। যেমন- ক্রীড়া ও লোকক্রীড়ার সংজ্ঞার সন্ধান, ক্রীড়া ও লোকক্রীড়ার সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সন্ধান, ক্রীড়ার বিভিন্ন তত্ত্ব, ক্রীড়ার দর্শন, লোকক্রীড়ার ব্যবহারিক মূল্য, লোকক্রীড়ায় খেলোয়াড় বিভাজন পদ্ধতি, সর্বোপরি শরীরচর্চায় লোকক্রীড়ার ভূমিকা ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলি উদঘাটিত হয়েছে ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে। আর এই তথ্যাদি সংগ্রহ কর্মকে পরিচালনা করেছে ক্ষেত্র সমীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি, যে পদ্ধতির কথা এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্ষেত্র সমীক্ষা ছাড়াও আরও কিছু পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহায্যও গ্রহণ করা হয়েছে। লোকসংস্কৃতি ও শারীর শিক্ষার বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন মূল্যবান মতামত এই গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছে। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থে লোকক্রীড়া বিষয়ে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে গবেষণার কাজে প্রেরণা ও সহায়তা করবে। এই ভাবে একাধিক দৃষ্টিকোণের আলোকে বাংলার লোকক্রীড়ার গভীর গবেষণার ফলে লোকক্রীড়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও উপযোগিতা স্পষ্ট ও দৃঢ় হবে। তাছাড়া এই ধরনের তথ্যমূলক বিশ্লেষণ দেশীয় খেলাগুলির প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের আনুগত্য ও সচেতনতা বাড়াবে।

পরিবর্তমান সমাজ প্রবাহে লৌকিক ঐতিহ্যও পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ ঐতিহ্য কখনো থেমে থাকে না। সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঐতিহ্য পরিবর্তিত হয়। বাংলার লোকক্রীড়ার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। লৌকিক ঐতিহ্যের ধারায় লোকক্রীড়া আবহমান কাল ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। প্রবাহিত হওয়ার সময় লোকক্রীড়ার ব্যাপকতা কখনো বেড়েছে, আবার কখনো হ্রাস পেয়েছে। সময়ের সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে লোকক্রীড়ার প্রভাব ও প্রসারে ওঠানামা অবশ্যম্ভাবী। মূল কথা হল, বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোকক্রীড়ার বিবর্তনের ধারায় রয়েছে। আরও বিস্তৃত ভাবে বলা যায় আমাদের সমাজে প্রাচীন কাল থেকে যে খেলাগুলি প্রচলিত ছিল — সে সবের সমস্তই যে পূর্বের মত একই ভাবে প্রচলিত আছে তা কিন্তু নয়। এমন অনেক খেলা আছে একসময় গুরুত্ব সহকারে অনুষ্ঠিত হত, আজ তা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। অর্থাৎ বর্তমানে ঐ খেলাগুলি চলমান রূপের পরিবর্তে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'রাজার কোটাল', 'গাদি', 'চিক্কা হেতেল', 'দাড়িয়াবান্দা', 'গাচ্ছুয়া-গাচ্ছুয়া', 'চেংগি ডাণ্ডি' ইত্যাদি। আবার কিছু খেলা আছে যা পূর্বের ধারা অনুসারেই সগৌরবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন - 'এক্কাদোক্কা', 'মার্বেল', 'রান্নাবাটি', 'ষোলঘুটি', 'ঘুড়ি ওড়ানো', 'ইকিড়-মিকিড়' ইত্যাদি। এ খেলাগুলির আবেদন এখনো স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অনেক খেলা যেমন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, ঠিক এর অন্য দিকে লোকক্রীড়ার ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ করেই নতুন নতুন খেলার সৃষ্টি হচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় — 'এলাণ্ডি লণ্ডন', 'রাজার মেয়ে ডিস্কো নাচ', 'স্টপ গো', 'চাঁদামারী চৈ চৈ', 'বল্লভপুর মোহনবাগান', 'শচীনছক্কা মেরেছে' ইত্যাদি। অর্থাৎ সমসাময়িক সময়কে কেন্দ্র করে নতুন নতুন খেলার আগমন ঘটেছে বাংলার সংস্কৃতিতে। আর এভাবেই বাংলার লোকক্রীড়ার ঐতিহ্য ক্রমশঃ ভরপুর হয়ে উঠেছে। মূল কথা হল, পরিবর্তিত সমাজ প্রবাহের চাপে লোকক্রীড়ার অবলুপ্তি ঘটেছে — এ কথা আজ বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। তবে যথার্থ অর্থেই লোকক্রীড়ার মৃত্যু নেই। লোকক্রীড়ার

বিবর্তনের রূপ রেখাকে বা জনপ্রিয়তা হ্রাসকে কখনোই সামগ্রিক ভাবে লোকক্রীড়ার বিলুপ্তি ঘটেছে তা কিন্তু বলা যাবে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ঐতিহ্য পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ থেমে থাকে না। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে --- লোকক্রীড়ার জনপ্রিয়তা পূর্বের তুলনায় ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। এই জনপ্রিয়তা হ্রাসের নানা কারণও লোকক্রীড়ার লালন-পালন কারীদের কাছ থেকে আলোচনা সাপেক্ষে উঠে এসেছে। মূলতঃ যে কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি হল —

● **শহরকেন্দ্রিক মানসিকতা ঃ** বর্তমান যুগে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান অনেক কমে এসেছে। গ্রামের মানুষ আজ শহরমুখী, শহরের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার সমস্ত কিছু অনুকরণে তারা ব্যস্ত। নিজস্ব ঐতিহ্যকে ভুলে সমস্ত কিছুর সঙ্গে শিষ্ট ক্রীড়াকেও তারা অনুকরণ করছে। শহরকেন্দ্রিক অনুকরণ প্রবণতা লোকক্রীড়ার জনপ্রিয়তা হ্রাসের একটি অন্যতম কারণ।

● **বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ** মানুষের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে সারা বিশ্বে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বেতার, দূরদর্শনের কল্যাণে সারা বিশ্বের ঘটনাকে মানুষ আজ ঘরের মধ্যে আনতে পেরেছে। এই গণমাধ্যমগুলি প্রতিনিয়ত চলচ্চিত্র, ভ্রমণ, সঙ্গীত ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করে চলেছে শিষ্টক্রীড়া। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম অনেক গ্রামীণ সংস্কৃতিকে তুলে ধরলেও গ্রাম্য খেলা বা লোকক্রীড়াকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা গ্রহণ করে না। বিজ্ঞাপনের যুগ, প্রচার যত বেশী আকর্ষণ ততই। স্বভাবতঃই এই প্রচারের আলোকে লোকক্রীড়াগুলি আলোকিত হচ্ছে না। পাশাপাশি অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে লোকক্রীড়া নয়, বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমকেই মানুষ বেছে নিচ্ছে।

● **সময়ের অপ্রতুলতা ঃ** শহুরে মানুষদের মত গ্রামীণ মানুষও আজ অতি ব্যস্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গ্রামীণ মানুষ আজ কৃষি কাজ ছাড়াও ব্যবসা বা ঐ জাতীয় অনেক কাজে যুক্ত। কর্মব্যস্ততা গ্রাস করেছে তাদের অবসর সময়। শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিশুরাও 'খেলা নয়, পড়া' এই মানসিকতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। নাচ, গান, আবৃত্তি, আঁকা সহ প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতায় আকৃষ্ট হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা ও কর্মব্যস্ততা শিশুদের অবসর সময়কে গ্রাস করছে। স্বভাবতঃই সময়ের অপ্রতুলতা লোকক্রীড়ার জনপ্রিয়তা হ্রাসের একটি অন্যতম কারণ।

● **জায়গার অপ্রতুলতা ঃ** জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটলেও কৃষি জমিব পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বাড়েনি বরং নগরায়নের কল্যাণে কমেছে। বর্তমান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই স্বল্প কৃষি জমিতে মানুষ বছরে তিনবার ফসল ফলিয়ে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছে। বিগত দিনে গ্রামের মানুষ তিন মাস কৃষি সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকত বাকি নয় মাস পেত অবসর ও খেলার জন্য বিস্তীর্ণ ধূ ধূ মাঠ। এই মাঠগুলি ছিল লোকক্রীড়ার আদর্শ স্থান।

● **ছোট পরিবারকেন্দ্রিক মানসিকতা ঃ** জনবিস্ফোরণ রুখতে সরকারীভাবে জনগণের সামনে 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার' এই শ্লোগান হাজির করা হয়েছে। দেরীতে হলেও গ্রামীণ মানুষ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ছোট পরিবার গড়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। বিগত দিনে যে কোন একান্নবর্তী পরিবারের শিশুরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন রকম লোকক্রীড়ায় মেতে উঠতো। বর্তমানে তা চোখে পড়ে না। এই একান্নবর্তী মানসিকতার অভাব ও ছোট

পরিবারকেন্দ্রিক মানসিকতা লোকক্রীড়ার জনপ্রিয়তা হ্রাসের একটি অন্যতম কারন।

● **ক্রীড়জীবন যাপনের মাধ্যম ঃ** ক্রীড়া আজ আর শুধু অবসর বিনোদনের মাধ্যম নয়। মানুষ আজ ক্রীড়াকে জীবিকার মাধ্যম ও পেশা হিসাবে গ্রহণ করছে। ভালো খেলোয়াড় হতে পারলে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আসবে, জীবনকে উপভোগ করা যাবে। গ্রামাঞ্চলেও এই মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। লোকক্রীড়ার মধ্য দিয়ে ভালো খেলোয়াড় হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। স্বভাবতঃই এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁরা শিষ্টক্রীড়ার প্রতি বেশী বেশী করে ঝুঁকছে, যা লোকক্রীড়ার জনপ্রিয়তা হ্রাসের একটি অনত্যম কারন।

● **সচেতনতার অভাব ঃ** বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি মানুষের দৈহিক শ্রম লাঘব করেছে। ফলস্বরূপ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং মানুষকে নানা ধরনের ব্যাধির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শারীর বিজ্ঞানীরা প্রচুর তথ্য দিয়ে মানুষকে কায়িক পরিশ্রম ও সক্রিয় জীবন ধারায় অভ্যস্ত হবার আহ্বান জানাচ্ছেন। এই সক্রিয়তা মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনে সাহায্য করবে সন্দেহাতীত ভাবে। লোকক্রীড়াগুলি এই জীবনধারার অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। মানুষের এই সচেতনতার অভাব লোকক্রীড়ার জনপ্রিয়তা হ্রাসের একটি অন্যতম কারণ।

তাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরী মানুষকে সচেতন করে তোলা। বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী মানুষকে সক্রিয়, কর্মক্ষম থাকতেই হবে। নিষ্ক্রিয় জীবন আনন্দমুখর হয়ে ওঠে না বরং নিষ্ক্রিয়তার ফলে নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয়, যা জীবনকে নিরানন্দে পর্যবসিত করে। UNESCO এবং বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা পৃথিবীব্যাপী মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে এক বিস্তৃত দাবি সনদ পেশ করেছে, যার অন্যতম হল লোকক্রীড়া ও দেশীয় ক্রীড়ার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং এই ক্রীড়াগুলির সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে শিশু-মহিলা-বৃদ্ধ সবার জন্য শরীর চর্চার ব্যবস্থা করা। খেলা সব বয়সের, সব মানুষের একথা মনে রেখে অবসর সময়ে নিষ্ক্রিয় বিনোদন নয়, চাই সক্রিয় বিনোদন। লোকক্রীড়া এই সক্রিয় বিনোদনের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে। জীবনে 'বছর' যোগ হয় কালের নিয়মে, প্রয়োজন বছর গুলোতে 'জীবন' যোগ করা। লোকক্রীড়া বছর গুলোতে জীবন যোগ করার অন্যতম মাধ্যম হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

আহমদ, ওয়াকিল : **বাংলার লোকসংস্কৃতি**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪।

আহমদ, ওয়াকিল : **লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯।

আহমদ, তোফায়েল : **লোক ঐতিহ্যের দশ দিগন্ত**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯।

ইসলাম, মযহারুল : **ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩।

ইসলাম, মযহারুল তরু : **চাঁপাই নবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতি পরিচিতি**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯।

খান, সামসুজ্জামান ও চৌধুরী, মোমেন : **বাংলাদেশের ফোকলোর রচনাপঞ্জি**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।

ঘোষ, বিনয় : **পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি**, কলিকাতা, ১৯৫৭।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার : **লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে**, বুক ট্রাস্ট, কলিকাতা, ১৯৯৯।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার : **বাঙলার লোকক্রীড়া**, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।

চক্রবর্ত্তী বরুণ কুমার : **বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ**, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা, ১৯৯৫।

চট্টোপাধ্যায়, তুষার : **লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান**, এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮৫।

চট্টোপাধ্যায়, রতনমনি : **গ্রামীণ খেলাধুলার কথা**, প্রবাসী, কলিকাতা, চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৫৯।

চৌধুরী, দুলাল : **লোকসংস্কৃতি সমীক্ষার পদ্ধতি**, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৮৯।

চৌধুরী, নারায়ণ : **ধর্ম : মৌলিক বনাম আনুষ্ঠানিক, যুক্তিবাদীর চোখে ধর্ম**, অগ্রনী বুক ক্লাব, কলিকাতা, ১৯৯২।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : **রচনাবলী (সাহিত্যের পথে)**, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, বাং কলিকাতা, ১৩৫৪ সন।

দত্ত, অমল : **ফুটবল খেলতে হলে**, আনন্দ পাবলিশার্স,

কলিকাতা, ১৯৬৯।
দত্ত, অমল : **ঘেরা মাঠ ছড়ানো গ্যালারী**, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭২।
দাস, অসীম : **বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস**, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৯১।
নন্দী, মতি : **স্ট্রাইকার**, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭২।
নন্দী, মতি : **কোনি**, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৪।
নাথ, প্রমোদ : **সেতু বন্ধন (তৃতীয় সংকলন)**, সেন্টার ফর কম্যুনিকেশান এ্যাণ্ড কালচারাল এ্যাকসান, কলিকাতা, ১৯৯৯।
নাহা, সত্যজিৎ : **ত্রিপুরার আদিবাসীদের আবহমান খেলাধূলা**, আবহমান, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম সংস্করণ, ২০০২।
পোদ্দার, সুস্মিতা : **লোকসংস্কৃতির ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ**, রুবি, হাওড়া, ২০০১।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস : **বাঙলার ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)**, কলিকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।
বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ : **বাংলার লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি**, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।
ব্যানার্জী, অলোক কুমার : **ওলিম্পিক আন্দোলন**, Olympic Centenary Commemoration, Athletic Coaches Association of West Bengal, Calcutta, 1996.
ভট্টাচার্য, অরুণ কুমার : **খেলার ক্রমবিকাশ**, প্রকাশিত হয়েছে Souvenir Cum Selected Writing of Prof. A. K. Bhattacharyya, Department of Physical Education, Kalyani University, 1993.
ভট্টাচার্য, আশুতোষ : **বাংলার লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া**, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩।
ভারতচন্দ্র, রায়গুণাকর : **ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (সম্পাদনায়)**, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বাং সন ১৩৯০।
ভৌমিক, নির্মলেন্দু : **লোকশ্রুতি (দশম সংখ্যা)**, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯৩।

মজুমদার, মানস : **লৌকিক সৃজনী**, পাইওনিয়ার ওয়ার্কস, মালদা, ১৯৮৫।

মণ্ডল, সুজয় কুমার : **লোকসংস্কৃতির ত্রিবলয়**, সেতুবন্ধন প্রকাশনা, সেন্টার ফর কমিউনিকেশান অ্যাণ্ড কালচারাল অ্যাকশন, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯।

মাইতি, প্রদ্যোত কুমার : **মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি**, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, তমলুক, মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।

মুখোপাধ্যায়, সুব্রত : **সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া**, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১।

রায়, নীহাররঞ্জন : **বাঙ্গালীর ইতিহাস**, আদিপর্ব (১ম ও ২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৮০।

রায়, সুশীল : **শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন**, সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৯৮।

সাঁতরা, তারাপদ : **ছড়া প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ**, কলিকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

সিদ্দিকী, আশরাফ : **লোকসাহিত্য**, প্রথম খণ্ড, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭।

সিদ্দিকী, আশরাফ : **লোকসাহিত্য**, প্রথম খণ্ড, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯৪।

সিদ্দিকী, আশরাফ : **লোকায়ত বাংলা**, সময় প্রকাশন, ঢাকা ১ম সংস্করণ, ২০০১।

সুর, অতুল : **বাংলার সামাজিক ইতিহাস**, কলিকাতা, ১৯৭৬।

সুর, অতুল : **বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়**, কলিকাতা, ১৯৭৯।

সুর, অতুল : **সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান**, কলিকাতা, ১৯৮০।

সেন, রথীন্দ্র কুমার : **শারীর শিক্ষার ইতিহাস**, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০।

সেনগুপ্ত, পল্লব : **লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ**, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫।

সেনগুপ্ত, শঙ্কর : **বাঙালীর খেলাধূলা**, ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬।

Abercrombie, Nicholas, : **The Penguin Dictionary of Sociol-**